কোচবিহারে ছাত্র আন্দোলন যে পথ বেয়ে এগিয়ে চলেছে

কোচবিহার জেলা কমিটি,
ভারতের ছাত্র ফেডারেশন

Cooch Behar a Chhatra Andolon Je Path Beya Agiay Chalechha

প্রকাশক :
অজয় বাগ্‌চী
সভাপতি, কোচবিহার জেলাকমিটি
ভারতের ছাত্র ফেডারেশন

সম্পাদনা ও গ্রন্থনা :
অমল কাঞ্জিলাল
অর্পিতা চক্রবর্তী

প্রকাশ কাল :
পঞ্চদশ জেলা সম্মেলন

প্রথম প্রকাশ :
৬-ই জানুয়ারী, ১৯৯৬

প্রচ্ছদ :
মৃণাল মহন্ত

মুদ্রণ :
ব্রজ ঘোড়ুই
গ্লাসগো প্রিন্টিং কোং প্রাঃ লিঃ
১৫১, মধুসূদন পালচৌধুরী লেন, কদমতলা, হাওড়া - ৭১১ ১০১

অনুদান : ১৫ টাকা

ঃ মুখবন্ধ ঃ

"মানব সভ্যতার প্রগতিশীল বিকাশ হল – ইতিহাস"। মানুষই ইতিহাসের স্রষ্টা। মানব সৃষ্ট ইতিহাসের সেই সব অমর কাহিনী বাদ দিয়ে শাসক শোষক শ্রেণী যুগ যুগ ধরে তাদের হীন শ্রেণীস্বার্থে, তাদের প্রয়োজন মতো ইতিহাস রচনা করিয়ে নিয়েছেন। সেইসব বিকৃত ইতিহাসে জনসাধারণের, শ্রমিকদের, কৃষকদের, ছাত্র-যুবকের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের নাম গন্ধ ও নেই। ইংরেজ আমলে এটাই ছিল স্বাভাবিক।

দেশীয় রাজন্যবর্গ ও ইংরেজদেরকেই মুরুব্বী মেনে নিয়েছিলেন। আমাদের কুচবিহারের রাজতন্ত্র সেই পথই অনুসরণ করে গেছেন।

ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ কিম্বা তাদের মিত্র দেশীয় রাজন্যবর্গ স্বাভাবিক কারণেই তাদের প্রয়োজনমতো বিকৃত ইতিহাস রচনা করিয়ে তোতা পাখীর মতো তা দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের গলাধঃকরণ করিয়েছেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় – এই বিকৃত ইতিহাস মমান্তিকভাবে আজও অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলেছে। এই বিকৃত ইতিহাসের মুখোশ খুলে দিয়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন ঃ

"ভারতবর্ষের যে ইতিহাস আমরা পড়ি এবং মুখস্ত করিয়া পরীক্ষা দিই, তাহা ভারতবর্ষের নিশীথকালের দঃস্বপ্ন-কাহিনীমাত্র। কোথা হইতে কাহারা আসিল, কাটাকাটি মারামারি পড়িয়া গেল, বাপে-ছেলেয়, ভাইয়ে ভাইয়ে সিংহাসন লইয়া টানাটানি চলিতে লাগিল, একদল যদি বা যায়, কোথা হইতে আরেক দল উঠিয়া পড়ে – পাঠান, মোগল, পর্তুগীজ, ফরাসী, ইংরেজ – সকলে মিলিয়া এই স্বপ্নকে উত্তরোত্তর জটিল করিয়া তুলিয়াছে।"

"কিন্তু এই রক্তবর্ণে রঞ্জিত পরিবর্তমান স্বপ্নদৃশ্যপটের দ্বারা ভারতবর্ষকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলে যথার্থ ভারতবাসীকে দেখা যায় না। ভারতবাসী কোথায়, এই সকল ইতিহাস তাহার কোন উত্তর দেয় না।"

"যে সকল দেশ ভাগ্যবান তাহারা চিরন্তন স্বদেশকে দেশের ইতিহাসের মধ্যেই খুঁজিয়া পায়। বাল্যকালে ইতিহাসই দেশের সহিত তাহাদের পরিচয় করাইয়া দেয়। আমাদের ঠিক উল্টা।" (ইতিহাস পৃষ্ঠা ঃ ১–৩)

এই 'উল্টা' ব্যবস্থাই স্বাধীনোত্তর ভারত আঁকড়ে ধরে আছে। তার কারণ আমাদের জানা। যে হতভাগ্য দেশ ১৭৫৭ থেকে টানা ১৯০ বছর নিরবিচ্ছিন্ন গণসংগ্রামের পর রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করেছে, সেই সংগ্রামের প্রকৃত ইতিহাস রচনা হয় নাই। দেশে 'উল্টা' ব্যবস্থাকে সোজা বলে, অসত্যকে সত্য বলে আঁকড়ে ধরা, সেই ইতিহাসকেই পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীদের মস্তিস্কে গুঁজে দেওয়া ছাড়া অন্য কি উপায় থাকতে পারে?

এটাই আমাদের দুর্ভাগ্য যে পণ্ডিতগণ সারাজীবন ধরে সংগ্রামের ময়দান থেকে নিরাপদ দুরত্ব বজায় রেখেছেন। নিজ গোষ্ঠী স্বার্থকেই প্রাধান্য দিয়েছেন, তাঁদের উপরই সংগ্রামের ইতিহাস রচনার ভার ন্যস্ত। তাতেই এই বিভ্রাট, তাই সংগ্রামের প্রকৃত ইতিহাসের স্থান তাদের রচনায় পাওয়া যায় না।

আনন্দের কথা, ভারতের ছাত্রফেডারেশনের কোচবিহার জেলা কমিটি এই জেলায় সংগঠিত ছাত্র আন্দোলনের সুবর্ণজয়ন্তীবর্ষ পূর্তীতে এবং সংগঠনের পঞ্চদশ জেলা সম্মেলনের প্রাক্কালে কোচবিহার জেলার ছাত্র আন্দোলনের অতীত ছাপা অক্ষরে ধরে রাখার নিরলস প্রয়াসে ব্রতী হয়েছে। ক্লান্তিহীনভাবে তারা তথ্য সংগ্রহ করেছে অন্ততঃ ছাত্র আন্দোলনের প্রকৃত ঘটনাসমূহ যতখানি সম্ভব ততখানি ধরে রাখতে।

বিগত দিনে সংগঠিত ছাত্র আন্দোলনের চলমান স্রোতে যে সমস্ত তথ্য সৃষ্টি হয় সে সব রক্ষণাবেক্ষণের অবস্থা বিদ্যমান ছিল না। এ জন্য প্রায় দুরূহ হয়ে পড়ে তথ্য সংগ্রহের কাজটি। তাই বিশেষভাবে মূলধন করতে হয়েছে ঐ স্রোতের সাথে যুক্ত এখনও যাঁরা কাছাকাছি আছেন তাঁদের স্মৃতিচারণ। এ সব সত্ত্বেও আমাদের ছাত্র কমরেডরা তথ্যনিষ্ঠ হবার ক্ষেত্রে চেষ্টার কোন প্রকার ত্রুটি করেন নি।

অতীত দিনের যা কিছু লেখা সংবাদপত্র পাওয়া গিয়েছে, এছাড়াও জেলা ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এমন অনেকের সঙ্গেই আলোচনা করে তাঁদের স্মৃতি ভাণ্ডারকে কাজে লাগানো হয়েছে এই মহৎ প্রয়াসে।

এখানে একথা আসতেই পারে যে, এই কাজে আরও অনেকের সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারত – কিন্তু তা সম্ভব হয়ে ওঠে নি। কখনো কেউ দৃষ্টি আকর্ষণ যদি করেন ছাত্র নেতৃত্ব সেই ত্রুটি সংশোধনে অবশ্যই যত্নবান হবেন – আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

হঠাৎ গজিয়ে ওঠা কোন ঘটনা এই জেলার ছাত্র আন্দোলন কখনোই নয়। এই আন্দোলন এগিয়ে চলেছে এক দীর্ঘতম ঐতিহ্য ও উত্তরাধীকারের ধারাকে উজ্জ্বলতম ভবিষ্যতের দিকে বহন করে। আন্দোলনে যাঁরা যুক্ত, আগামীতে যারা যুক্ত হবেন, প্রত্যেককেই এই সুমহান ঐতিহ্যের সাথে অবশ্যই পরিচিতি লাভ করতে হবে, এতে কোন দ্বিধা থাকতে পারে না। তাই এই ধরনের প্রয়াস অভিনন্দনযোগ্য। এই প্রয়াসের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

জেলার ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস নয় এই বইটি। আগামীতে এই ইতিহাস চর্চায় যারা প্রয়াসী হবেন – ইতিহাস তৈরীর 'মালমশলা' এখান থেকে প্রভূত পরিমানে তারা হয়তো পাবেন।

স্বাধীনোত্তর চারযুগ অতিক্রম করলেও ভারত আজও সমস্যাসঙ্কুল অবস্থায়। দেশ এক জটিল, কঠিন সঙ্কটের আবর্তে নিমজ্জিত। আন্তর্জাতক দুনিয়ার নানাবিধ বিপদসঙ্কেত আজও বিদ্যমান। সমাজতান্ত্রিক সমাজকে ছিন্নভিন্ন করতে শত্রুরা আজ মরিয়া। সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে অগ্রসরমান নিপীড়িত জনগণের আন্দোলন আজ আক্রান্ত। স্থায়ীত্বে ও গভীরতায় দীর্ঘ নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে এই সময়ে বুকে দৃঢ় আস্থা এবং প্রত্যয় নিয়ে। আমাদের তরুণ তাজা ছাত্র সমাজকে এই কাজে বীরত্বপূর্ণ সৈনিকের দায়িত্ব অবশ্যই পালন করতে হবে। সুগভীর আদর্শবোধ, গৌরবজনক আত্মত্যাগ এবং বিগত দিনের ছাত্র-ছাত্রীদের সংগ্রামী, সাহসী ভূমিকাই আগামী প্রজন্মের তরুণ ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহিত করবে, অনুপ্রাণিত করবে – এ বিশ্বাস আমার আছে। খুশী হব, বইটি যদি একাজে সাহায্য করে। সংগ্রামী ছাত্রসমাজ এই বইটি অবশ্য পাঠ্য বলে বিবেচনা করবে আশা করি।

– নরেন দত্ত –

: আমাদের কথা :

১৯৯৫ সাল। এ জেলার সংগঠিত ছাত্র আন্দোলনের সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ হিসাবে পালিত হচ্ছে। বিগত অর্ধ শতাব্দীতে রাজতন্ত্রের শোষণ শাসনের শৃঙ্খল থেকে মানুষের মুক্তির জন্য এবং পরবর্তী দশকগুলিতে প্রতিক্রিয়াশীল শাসক-শোষকের বিরুদ্ধে, ছাত্রসহ জনগণের মুক্তির জন্য দুর্বার ছাত্র আন্দোলন গড়ে উঠেছে। সেই উজ্বল ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী হিসাবে আমরা গর্বিত। এ জেলার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ উৎযাপনের সুযোগ পেয়ে আমরা নিজেদের ধন্য মনে করছি।

বিগত অর্ধ-শতাব্দীতে জেলার ছাত্র আন্দোলনকে অনেক আঁকাবাঁকা পথ অতিক্রম করতে হয়েছে। উগ্র জাতীয়তাবাদী, সংশোধনবাদী ও সংকীর্ণতাবাদী শক্তির বিরুদ্ধে আপোসহীন লড়াই করে এখানকার ছাত্র আন্দোলনকে এগিয়ে যেতে হয়েছিল। তাই কোন বাধাই এখানকার ছাত্র আন্দোলনের কাছে অনতিক্রমনীয় নয়। আন্দোলনের খতিয়ান, সংগঠনী ক্ষমতা ও দক্ষতা, উন্নত চেতনা আর আত্মত্যাগ ও রক্তদানের মধ্য দিয়ে কোচবিহারের দামাল ছাত্র সমাজ ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান দখল করেছে। "পাঁচ শহীদের তাজা খুনে লাল সাগর-দীঘির জল/তখন তোমার দু'চোখে আগুন কিন্তু অচঞ্চল/সেদিন বুঝেছি তোমার বুকে কি শানিত অঙ্গীকার/অভিনন্দন তোমাকে কোচবিহার।" কবি সত্যিই ভবিষ্যৎদ্রষ্টা।

শান্ত, পান-তামোল ধান, পাট, তামাক সমৃদ্ধ কোচবিহারের শুভ্রতাকে রক্তাক্ত করেছে 'কামতাপুরীরা'। জাতীয় ঐক্য-সংহতি রক্ষার্থে স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্রের পতাকাবাহী ছাত্র ফেডারেশনের সদস্য সংগঠকরা আজ আক্রান্ত ও রক্তাক্ত। প্রতিরোধ চলছে, প্রতিরোধ বাড়ছে। পূর্বসূরীদের কাছে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ, সমাজতন্ত্রের সোনালী স্বপ্ন ছাত্র মননে আজ হিন্দোল তুলেছে।

বর্তমান প্রজন্মের ছাত্র আন্দোলনের কর্মীদের কাছে এই ঐতিহ্যময় ঘটনাসমূহ তুলে ধরার ব্যাকুলতায় 'কোচবিহারের ছাত্র আন্দোলন যে পথ বেয়ে এগিয়ে চলেছে' এইটি আমরা প্রকাশ করছি। বর্তমান জেলা কমিটি এই বই প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তা প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে মাত্র দু'মাস পূর্বে। সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ পালনের প্রসঙ্গ আলোচনার সময় নির্দিষ্টভাবে সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করা হয়। স্বভাবতঃই অত্যন্ত স্বল্প সময়ের মধ্যেই এ বইটি প্রকাশ করার ঝুঁকি আমরা নিয়েছি। প্রাক্তন ছাত্রনেতা ও কর্মীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ, পুরানো পত্র-পত্রিকার সাহায্য নিয়ে কাজটি সারতে হয়েছে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে। এই উদ্যোগকে বাস্তবায়িত করতে বুকভরা ভালবাসা নিয়ে ছাত্রআন্দোলনের হিতাকাঙ্খী বহু ব্যক্তিত্বের সাহায্য আমাদের সমৃদ্ধ করেছে। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন – 'গ্লাসগো'-এর কর্তৃপক্ষ সহ সকল কর্মীবৃন্দ। সংগঠনের সকল সদস্যের পক্ষ থেকে সকলকে উষ্ণ বৈপ্লবিক অভিনন্দন জানাই। বইটি প্রকাশিত হওয়ার পর আরও গঠন মূলক পরামর্শের আবেদন আমরা রাখছি। আশা রাখি এই বই ছাত্র আন্দোলনের সংগঠক ও কর্মীদের কাজে লাগবে এবং আগামী দিনে আন্দোলন ও সংগঠন গড়ে তুলতে এই বই তাদের সাহায্য করবে।

বিদ্যুৎ দে
সম্পাদক
ভারতের ছাত্রফেডারেশন
কোচবিহার জেলা কমিটি

ঃ সূচীপত্র ঃ

ঐতিহাসিকগণ নানা সূত্র থেকে অতীতের সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে থাকেন। এই ধরণের সূত্রগুলিই হল – ইতিহাসের উপাদান। সাহিত্য, কিংবদন্তী, মুদ্রা, প্রাচীন ধ্বংসবিশেষ, শিল্প কীর্তি, ঐতিহাসিক গ্রন্থ, বৈদেশিক বিবরণ, দলিলপত্র, বেসরকারী চিঠিপত্র প্রভৃতি উপকরণের উপর নির্ভর করে আমাদের দেশের ইতিহাস রচিত হয়েছে। পৃথিবীর যে কোন দেশের ইতিহাস পাঠ করলে দেখা যায় – দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা, দেশবাসীর চরিত্র ও রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা গঠনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। পৃথিবীর অন্যান্য জায়গার মতো কুচবিহারের ভৌগতিক অবস্থাও কুচবিহারবাসীর চরিত্রগঠন ও নিয়ন্ত্রন করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। একজন ঐতিহাসিক এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন – 'Geography governs History'.

কুচবিহার জেলার ভৌগলিক আকার অনেকটা ত্রিভুজাকৃতি। উত্তরবঙ্গের অন্যতম প্রান্তিক জেলা কুচবিহারের আয়তন – ৩৩৮৬ বর্গ কিঃ মিঃ। এই জেলার উত্তরে জলপাইগুড়ি জেলা, পূর্বে আসামের গোয়ালপাড়া ও কোঁকড়াঝাড় এবং দক্ষিণ ও পশ্চিমে বাংলাদেশের রংপুর জেলা। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ৪৬৭৩৫ কিঃ মিঃ দীর্ঘ আন্তর্জাতিক সীমা দক্ষিণ ও পশ্চিম প্রান্ত নির্দেশ করছে। অন্যদিকে কুচবিহার জেলার মধ্যে বাংলাদেশের ছিটমহলের সংখ্যা ৯২টি। বাংলাদেশের মধ্যে এই জেলার ছিট মহলের সংখ্যা ১২২টি। দুই সার্বভৌম রাষ্ট্রের একের মধ্যে অন্যের এতগুলি ছিট মহলের অবস্থান পৃথিবীতে নজির বিহীন।

বলাবাহুল্য এই জেলা কৃষিপ্রধান। কৃষিই অধিকাংশের প্রধান জীবিকা। ধান, পাট, তামাক প্রধান ফসল। কুটির শিল্প একটি উল্লেখযোগ্য অবলম্বন। এর মধ্যে তাঁত ও বিড়ি শিল্পই প্রধান। জেলার মোট জনসংখ্যার শতকরা ৮৪ জনই কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত। এক সময়ে মোট কৃষিজীবির মধ্যে শতকরা ৭০ জনই ছিলেন বর্গাদার বা আধিয়ার।

বর্তমানে বর্গাচাষীদের সংখ্যা শতকরা ৩৫ জন। ক্ষেতমজুর ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। জেলার মোট জনসংখ্যার এক উল্লেখযোগ্য অংশের মানুষ দারিদ্রসীমার নীচে বসবাস করেন।

এখানকার ভাষা বাংলাভাষা। কিন্তু কিছু ভাষায় 'ং', 'ঃ' এবং হসন্তের ব্যবহার বেশী। 'র'-কে 'অ' উচ্চারণ প্রায়শঃই করা হয়ে থাকে। সংস্কৃতির মান উন্নত ছিল না। পল্লীগাথা, গানে প্রেম-বিরহের আবেদনেরই প্রাধান্য তবে বাঁশের বাঁশীসহ 'বিষহরি' গান এবং দোতারা যন্ত্রের সাহায্যে ভাওয়াইয়া গান এখানকার বৈশিষ্ট্য।

প্রাক-ইতিহাস পর্ব ঃ

১৯৪৫ সালের ২১শে আগষ্ট কুচবিহারের ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্র-আন্দোলন ও ছাত্রফেডারেশনের প্রতিষ্ঠাকে আমরা জেলার সংগঠিত ছাত্র আন্দোলনের শুরু বলে ধরে নিয়েছি। কিন্তু ইতিহাস সচেতন যে কোন মানুষ একথা বোঝেন যে, পৃথিবীর কোন ঘটনাই হঠাৎ করে ঘটে না। মানুষের ইতিহাস থেকে পৃথিবীর ইতিহাস পর্যন্ত সব ইতিহাসেরই একটা আগের পর্ব থাকে। আমাদের সংগঠিত ছাত্র আন্দোলনেরও এমনই একটি প্রাক্ ইতিহাস পর্ব রয়েছে। এটা ঠিক যে আমাদের কুচবিহারের রাজতন্ত্র অবসানের প্রায় শেষ পর্বে ছাত্রফেডারেশনের জন্ম হয়েছিল। কিন্তু ছাত্রদের সাংগঠনিক প্রচেষ্টার নানা নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে রাজতন্ত্রের স্বৈরশাসনের নানা পর্বে।

এখানকার মানুষের রাজতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম আর ছাত্রদের সাংগঠনিক প্রচেষ্টার উদ্যোগ কার্যতঃ একে অপরের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল।

কোচবিহারের দীর্ঘকালের ইইতহাস রাজতন্ত্রের স্বেচ্ছাচারী, মধ্যযুগীয় বর্বরতার ইতিহাস। বৃটিশ ভারতে করদমিত্র রাজ্যগুলির মধ্যে অন্যতম রাজ্য হিসাবে এই রাজ্যে সামন্ততান্ত্রিক স্বেচ্ছাচারীতার যাঁতাকলে নিষ্পেষিত প্রজাবর্গের দুর্গতির কোন পরিসীমা ছিল না। সমস্ত জমির অবিসংবাদী মালিক ছিল স্বেচ্ছাচারী রাজা, প্রজাস্বত্ব বলে কিছু ছিল না। নির্মম শোষণে প্রজাবর্গের বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের কৃষককুল ও গরীবদের দুর্দশা চরমে উঠেছিল। ১৯৩০ সালে প্রকাশিত শ্রী ক্ষেত্রমোহন ব্রহ্ম রচিত কুচবিহারের বিবরণ পুস্তিকায় দেখা যায় এই রাজ্যের তৎকালীন জনসংখ্যা ছিল ৫ লক্ষ ৯২ হাজার ৪৮৯ জন, কিন্তু বার্ষিক আয় ছিল ২৮ লক্ষ টাকা। বৃটিশ রাজকে কর দিতে হত ৭৭ হাজার ৭০০ টাকা। এর থেকেই শোষণের রূপটি সহজেই অনুমেয়। যারা খাদ্য যোগাতেন, রাজস্ব যোগাতেন এককথায় যাঁরা ছিলেন অর্থনীতির ভিত্তিস্বরূপ, প্রকৃতপক্ষে তাঁরাই ছিলেন নিঃস্ব। দুর্ভিক্ষ, মহামারী, জমি থেকে উৎখাত হওয়া ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা।

ভারতের মহান কৃষকবিদ্রোহের ইতিহাসে দেখা যায় বৃটিশ আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ১৭৬৬ সালে কোচবিহার রাজ্যের স্বাধীন অস্তিত্ব রক্ষাকল্পে কৃষক নায়ক - রামানন্দ গোঁসাই-এর নেতৃত্বে সংগঠিত কৃষকবাহিনী লেঃ মরিসনের বিশাল বৃটিশবাহিনীকে পর্যুদস্ত করে দেশপ্রেম ও অসাধারণ রণকুশলতার পরিচয় দিয়েছিলেন। ১৭৬৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বৃটিশ ভারতে জরিপ বিভাগের অধিকর্তা জেমস্ রেনেল জরিপের উদ্দেশ্যে একদল সশস্ত্র কর্মচারী সহ দিনহাটায় এসেছিলেন। ইতিমধ্যে পলাশীর যুদ্ধের মধ্য দিয়ে এদেশে বনিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্বরী রাজদণ্ডরূপে। এর ফলে বাংলার অতুলনীয় ধনসম্পদ ইংরেজ লাভ করায় গোটা দেশে ইংরেজ আধিপত্য বিস্তারের পথ সুগম হল। ধ্বংস করা হল দেশীয় কুটির শিল্পকে। শুরু হল গ্রাম-নগরের মধ্যে ব্যাপক হাহাকার। কৃষককুল সর্বহারায় পরিণত হ'ল। ইতিমধ্যে ১৭৬৩ তে সারা বাংলা ও বিহারে মজনু শাহ, ভবানী পাঠক, দেবী চৌধুরানী, পিতাম্বর, শ্রীনিবাস এঁদের নেতৃত্বে শোষণ উৎপীড়নের বিরুদ্ধে কৃষকরা বিদ্রোহ ঘোষণা করল, বঙ্গদেশে যা 'সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ' নামে পরিচিত। দেশীয় রাজ্য কুচবিহারেও কৃষক সম্প্রদায় এই বিদ্রোহের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে জেমস্ রেনেল-এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান এবং রেনেল গুরুতর আহত অবস্থায় সদলবলে পালিয়ে যায়।

ওয়ারেন হেস্টিংস-এর বুদ্ধি কৌশলে ১৭৭৩ সালের ১৬ই জানুয়ারী কুচবিহার বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ আশ্রিত করদমিত্র রাজ্যে পরিণত হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর থেকে ৩০-এর দশক পর্যন্ত বৃটিশ ভারতে যে একের পর এক গণআন্দোলন, বিদ্রোহের দুর্বার তরঙ্গের সৃষ্টি হয় তা তৎকালীন কুচবিহারের জনজীবনে বিশেষ কোন আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে নি। এই রাজ্যের রাজার প্রতি 'অনুগত' প্রজাকুল 'পান থেকে চুন খসে পড়া'র ভয়ে সদা সন্ত্রস্ত থাকত। বিখ্যাত ভূ-পর্যটক রামনাথ বিশ্বাসের কোচবিহার ভ্রমণ বিবরণী'তে ('ভারত ভ্রমণ' – রামনাথ বিশ্বাস) তৎকালীন অবস্থার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়।

কুচবিহার রাজ্যের সামন্ততান্ত্রিক নির্মম শাসন শোষণের প্রকৃষ্ট চিত্র পাওয়া যাবে – ভাওয়াইয়া গানের একটি কলিতে – "লাঙল বেচায়, জোয়াল বেচায় আরও বেচায় কাল/খাজনার আপাতে বেচায় দুধের ছাওয়াল" – বুকানন হ্যামিলটনের 'ইস্ট ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে (৩য় খণ্ড – পৃষ্ঠা নং - ৬৮১)

এর নজির পাওয়া যায়। 'কুচবিহারের ইতিহাস' গ্রন্থে রাজ্যসভার প্রাচীন কাগজপত্রে এর উল্লেখ আছে। এসব থেকে জানা যায় – অষ্টাদশ শতকের শেষ দশকেও কুচবিহার রাজ্যে ক্রীতদাস বিক্রয়ের প্রথা চালু ছিল। মুখের অন্ন জোগাতে না পেরে অভাবক্লিষ্ট পিতামাতা নিজের সন্তানকে বিক্রী করে দিতেন। অভাবী চাষী পেটের দায়ে নিজেকে বন্ধক দিতেন। টার্নার লিখেছেন – দৈনিক সর্বোর্দ্ধে এক আনা ব্যয়-এ মানুষকে দুইবেলার খাদ্য সংগ্রহ করতে হ'ত। মার্শী ও শোভের রিপোর্টে (২য় খণ্ড পৃষ্ঠা-৭৪) দেখা যায় যে এই রাজ্যে ধর্মের ধ্বজাধারী একদল সন্যাসীর আবির্ভাব ঘটেছিল। এরা ছিল গিরি বা মহন্ত সম্প্রদায়। এরা প্রকাশ্যে সুদের ঢালাও ব্যবসা চালাত। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুচবিহারস্থ কমিশনার ডগলাসের চিঠি থেকে রাজানুগৃহীত তৎকালীন ব্রাহ্মণ্য তাণ্ডবের কিছু তথ্য জানা যায়। ১৭৬৬ সালে জনৈক চিরঞ্জীব চক্রবর্তী রাজ দরবার থেকে অনেকগুলো তালুকের হিন্দু অধিবাসীদের কাছ থেকে তাদের করণীয় প্রায়শ্চিত্তের জন্য ধর্মদণ্ডের কড়ি আদায়ের অধিকার পেয়েছিলেন। এই ধর্মীয় কর্তব্য পালন করে ঐ গুরু অনধিক দুই বছরের মধ্যে তিনশো বিঘারও বেশী জমির মালিক হয়েছিল। ডগলাস (১৭৯১) এবং আমুটির রিপোর্টে দেখা যায় এই রাজ্য থেকে কয়েক হাজার প্রজা দেশত্যাগী হয়েছিলেন ব্রাহ্মণ্য দাপটের প্রভাবে। এত অত্যাচার-এর ফলে কুচবিহারের মানুষ রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারেন নি।

অবিভক্ত বাংলার মাটিতে দেশের মুক্তি সংগ্রামের উত্তাল তরঙ্গ স্পর্শ করতে পারে নি কুচবিহারের মাটি। শোনা যায় ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের কিছুটা প্রভাব বিস্তারের অতি ক্ষীণ একটা চেষ্টা ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্রদের মধ্যে করা হয়েছিল। রাজার ধমকে অঙ্কুর অবস্থাতেই তা বিনষ্ট হয়। শহরের অতি প্রাচীনদের কেউ কেউ বলেন যে সেই সময় পুণ্ডিবাড়ীর আইনুদ্দীন পণ্ডিত প্রমুখ দু'চারজন নাকি অসহযোগ আন্দোলনের চেষ্টা করেছিলেন। কাজী নজরুল ইসলাম ঐ সময় কুচবিহারে এসেছিলেন এবং রাজভক্তদের কাছ থেকে তিনি প্রতিকূল সাড়া পেয়েছিলেন বলে জানা যায়।

উনিশ শতকের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে বঙ্গভূমি যখন কম্পিত, তখন দেশীয় রাজার স্বৈরাচারী শাসনের আবেষ্টনী ভেদ করে সেই আন্দোলন আছড়ে পড়েনি এই জেলায়। অসূর্যম্পস্যার মতো করদমিত্র রাজ্য কুচবিহার ছিল নিস্তরঙ্গ। বলা যায় – চারপাশের আন্দোলনের মাঝে একটি বোবা দ্বীপ। এই বোবা রাজ্যের আক্ষেপ ছিল, ক্ষোভ ছিল। কিন্তু স্বৈরাচারের কষাঘাতে তা কখনো দানা বাঁধে নি, ফেটে পড়েনি, তুষের আগুনের মতো জ্বলেছে কুচবিহারের মানুষ, কিন্তু দাবানল হয়ে জ্বলে উঠতে পারে নি।

মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও দেশবরেণ্য নেতা চিত্তরঞ্জন দাশের স্থান হয় নি এ রাজ্যে। সমাজ সংস্কারক রায়সাহেব পঞ্চানন বর্মার নেতৃত্বে সে সময় কিছু সমাজ সংস্কারমূলক কাজ হয়েছিল। তিনি কুচবিহারের অধিবাসীদের উন্নত সংস্কৃতি ও শিক্ষার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু রাজরোষের প্রকোপে রায়সাহেবকেও শেষ পর্যন্ত কোচবিহার থেকে বহিষ্কৃত হতে হয়েছিল। সমাজ সংস্কারের আন্দোলন কায়েমী স্বার্থকে আঘাত করেছে বলেই রাজশাসনের আক্রমণের শিকার হতে হয়েছে সমাজ সংস্কারকদের।

ক্রমশঃ বাহিরের চাপ, পরপর আঘাতের পর আঘাতে স্বৈরাচারীর বেষ্টনীতেও ফাটল ধরতে শুরু করল। যে সমস্ত ছাত্ররা কোচবিহারের বাইরে থেকে পড়াশুনা করত তারা মাঝে মাঝে ফুঁসে

উঠত, বিক্ষোভ দেখাত। কিন্তু রাজার অনুশাসনে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রাজ্য ছাড়া করত তাদের, প্রতিবাদ করলে কয়েদখানায় ঢুকতে হ'ত। তাই ছাত্রদের আন্দোলন এবং জাতীয় আন্দোলন-এর সামান্যতম রশ্মিকেও স্বেচ্ছাচারের অন্ধকারে ডুবিয়ে দিত। এইভাবে আঘাত প্রত্যাঘাতের মধ্যে ছাত্র আন্দোলন শেষ পর্যন্ত স্বৈরাচারীর আবেষ্টনী ছিঁড়ে ফেলে।

এই সময়কালের মধ্যে কয়েকটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একবার, কুচবিহার শালবনের নদীর পার্শ্বে প্রফুল্ল রায়ের 'ঠিকাদার' সিনেমার সুটিং চলছিল। প্রচুর ছাত্রসহ সাধারণ জনতার ভিড় পড়ে যায় সেখানে। রাজার তৎকালীন ADC পূর্ণেন্দু নারায়ণ-এর নির্দেশে পুলিশ বাহিনী জনতার ভিড়ে লাঠি চার্জ করে। সেই সময়ে রাজকুমারী গায়েত্রী দেবীর বিবাহ উপলক্ষ্যে কুচবিহারের স্কুল-কলেজ সব বন্ধ রাখা হয়েছিল। কেননা অভ্যাগতদের ভুড়িভোজের ব্যবস্থা হয়েছিল। শিক্ষার দৈনন্দিন পাঠক্রম বন্ধ রেখে এই প্রমোদের বিরুদ্ধে এবং পূর্ববর্তী ঘটনার প্রতিবাদে ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্ররা নির্মল দত্ত, হারু মুখার্জী প্রমুখের নেতৃত্বে রাজভোজ সহ 'ফ্রি সিনেমা' দেখা বয়কট করেছিলেন।

শিক্ষার থেকে আহরিত চেতনার বলে সে যুগের ছাত্রসমাজ পৃথিবীর অন্য দেশের মুক্তি সংগ্রাম সম্পর্কে উৎসাহিত হয়েছিলেন। তাদের দেশপ্রেমের প্রেরণার রসদ ছাত্ররা সংগ্রহ করতেন ইতালী ও আয়ারল্যাণ্ডের বীরপূর্ণ মুক্তিসংগ্রামের কাহিনী থেকে। সেদিক থেকে বলা যায় আজকের যুগের প্রগতিশীল ছাত্র আন্দোলনের বীজটি ১৯৪০-৪১ এর গোড়াতেই অনিল রায়, বীরেন দে সরকার, বিমল মুস্তাফী, বিনয় ভৌমিক, মধু সেন, মাধু সেনগুপ্ত প্রমুখের নেতৃত্বে কুচবিহার সুটকাবাড়ীর তোর্ষাচরের কুলবনে গোপন সভার মধ্য দিয়ে উপ্ত হয়েছিল। আজকের ছাত্র সমাজের মধ্যে বিভিন্ন দেশের মুক্তি সংগ্রামের প্রতি সহমর্মিতার যে ঐতিহ্য আমরা দেখি তার বীজটি বপন করেছিলেন আজ থেকে অর্ধশতাব্দী আগের সেই দেশপ্রেমিক ছাত্ররাই। কিন্তু পরবর্তীতে ছাত্রদের সংগ্রামের এই স্পৃহা সাময়িকভাবে রাজরোষের কাছে থমকে গিয়েছিল।

প্রাক্-পর্যায়ের ঘাত প্রতিঘাতে আন্দোলন স্তিমিত হয়ে এসেছে বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হলেও ১৯৪৫ সালে বাস্তবে পরিণত হল কোচবিহারের ছাত্র আন্দোলনের সূর্যাস্তের সূর্যোদয়। আগস্ট '৪৫ - ধ্বনি থেকে প্রতিধ্বনিত হতে থাকল বঞ্চিতের কণ্ঠস্বর। সগর্বে উড্ডীন হল রক্তাক্ষরে বিধৃত -প্রগতির অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ছাত্রফেডারেশনের পতাকা। সমাজে অসীম প্রভাব বিস্তারকারী, জনশক্তির সবচেয়ে সজীব এবং প্রাণোচ্ছল অংশ ছাত্রসমাজ সংগঠিত আকারে এই প্রথম ঝাঁপিয়ে পড়ল স্বেচ্ছাচারী রাজশক্তির ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে, রাজ সিংহাসনকে প্রকম্পিত করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতি : কুচবিহারে সংগঠিত ছাত্র-আন্দোলনের সূচনা:

১৯৪৫ সাল – দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ পর্যায়। জাপানের হিরোসীমা নাগাসাকিতে অ্যাটম বোমের বিস্ফোরণে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তার দম্ভের প্রকাশ ঘটায়। ভারতে এই সময় বৃটিশ অধীনতার বিরুদ্ধে স্বাধীনতার সংগ্রাম ক্রমশঃ তুঙ্গে উঠছে। একদিকে রাজবন্দীদের মুক্তির দাবী, আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তি, বিদ্রোহী নৌ সেনাদের অমর কাহিনী প্রচার ইত্যাদিতে উত্তাল গোটা বাংলা। অন্যদিকে রাজপথের মিছিলে ভিয়েতনামের মুক্তিযোদ্ধাদের সমর্থনে প্রাণ দিচ্ছেন ছাত্ররা। ছাত্র ফেডারেশনের

কর্মী সুকান্তের ভাষায় – "আকাশে বাতাসে জিজ্ঞাসে উদ্দাম/গুণ্ডার দলে আজও লেখাও নি নাম।" ঠিক এই সময়টিতে কুচবিহারের ছাত্রসমাজ তাদের নব লব্ধ রাজনৈতিক চেতনার বোধি আলোকে পান-তামোল, ধান, পাট, তামাক সমৃদ্ধ কোচবিহারবাসীর কৌপীন সর্বস্বতার রাজনৈতিক তাৎপর্য্য অনুধাবন করতে শেখায় এবং এদের মূল শত্রু যে কোচবিহারের রাজতন্ত্র সে সম্পর্কে সম্যক্ সচেতন হওয়ার পাশাপাশি এই সচেতনতাও ছাত্রসমাজের উপলব্ধিতে এসেছিল যে রাজশক্তির মদতদাতা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যদি শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলা না যায়, অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে যদি চূর্ণ বিচূর্ণ করা না যায় তবে সামগ্রিক শোষণমুক্তি কোন ভাবেই সম্ভব নয়।

ভারতের এই লড়াইয়ের সময় কোচবিহারের মানুষ রাজতন্ত্রের নাগপাশের বন্ধনে পড়ে আছে। এ রাজ্যে সমস্ত রাজনৈতিক আলোচনা নিষিদ্ধ, এমনকি ঘরবাড়ী তৈরী করবার ক্ষেত্রে দোতলা বাড়ী করা নিষিদ্ধ ছিল (যেহেতু রাজার প্রাসাদ দোতলা)। এককথায়, পরিপূর্ণ স্বৈরাচারী সামন্ততান্ত্রিক রাজতন্ত্র তখন কায়েম ছিল। যে কোন সময় রাজা যে কোন প্রজার জমি খাস করে দিত। প্রজাদের সম্পত্তির বা জীবনের কোন অধিকার ছিল না। এগুলোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বা অনুযোগ রাজদরবার বরদাস্ত করত না। প্রতিবাদ করলে সঙ্গে সঙ্গে রাজদ্রোহী ঘোষণা করে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কুচবিহার ত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হত। এরই পরিপ্রেক্ষিতে কোচবিহার-এর ছাত্রদের এক গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করতে দেখা গেছে তা হল – ১৯৪৫-এর ২১শে আগস্ট রাজতন্ত্রের পাহারাদার মিলিটারী ইনফ্যান্ট্রির বিরুদ্ধে ছাত্রসহ সমস্ত জনগণের বিক্ষোভ ও জনজাগরণ কোচবিহারের ইতিহাসে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে এই প্রথম বিক্ষোভে ফেটে পড়ে যা ব্যক্তি স্বাধীনতার আন্দোলনে পর্যবসিত হয়। এই ছাত্র আন্দোলনই সামন্তরাজার স্বৈরাচারী অর্গল ভেঙে আলোর স্পর্শে দুঃখের কাল কেটে যাবার পথ করে দেয়।

আন্দোলনের সূত্রপাত : ২১শে আগস্ট ১৯৪৫ :

১৯৪৫ এর ২১শে আগস্ট-এর ঘটনার সূত্রপাত এইরকম – ভিক্টোরিয়া কলেজ অধুনা এ. বি. এন. শীল কলেজ ছাত্রাবাসের সামনে দু'জন মিলিটারী একই সাইকেলে চড়ে যাওয়ার সময় একজন পৌঢ় পথচারীকে ধাক্কা দেয়। ঐ পৌঢ় পথচারীটি হলেন তৎকালীন কোচবিহারের অধ্যাপক দুর্গাকিঙ্কর বাবুর (দুর্গাকিঙ্কর ভট্টাচার্য) সহপাঠী মনোরঞ্জন মজুমদার। আহত পথচারীকে সুশ্রুষার পরিবর্তে সঙ্গে সঙ্গে তারা সাইকেল থেকে নেমে নির্মমভাবে প্রহার করতে থাকে। প্রত্যক্ষদর্শী ছাত্রাবাসের আবাসিকরা স্বভাবতঃই একজন নিরীহ ভদ্রলোকের প্রতি এই বর্বরোচিত আচরণে ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং ঘটনাস্থলে এসে জোয়ান দুটিকে উত্তম মধ্যম দিয়ে সাইকেলটি ভেঙে দেয়। দুই মিলিটারী তাদের হেড-কোয়ার্টার্সে গিয়ে ছাত্রদের নামে অভিযোগ করলে, মিলিটারী কর্তৃপক্ষের মধ্যে তাদের অফিসার কুমার পূর্ণেন্দু নারায়ণ ও দীনেশ চন্দ্র চন্দ, মিলিটারীদের মধ্যে ছাত্র-ছাত্রী বিরোধী উত্তেজনা সৃষ্টি করে কলেজে এবং ছাত্রাবাসে রুট মার্চ করায়। বেলা তখন প্রায় চারটা – হঠাৎ দু'দিক থেকে কলেজ ও ছাত্রাবাস মিলিটারীদের দ্বারা আক্রান্ত হতে দেখে হতবাক্ ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লাসরুম ছেড়ে অধ্যক্ষের ঘরে আশ্রয় নেয়। ইতিমধ্যে মিলিটারীরা এক রিক্সাচালকের টিকি কেটে নেয় ও রিক্সা ভাঙচুর করে। শুধু তাই নয় উন্মত্ত মিলিটারীরা অধ্যক্ষ শ্রী ভোলা ধরের উপর চড়াও হয়। অধ্যাপক

দুর্গাকিঙ্কর ভট্টাচার্য, ক্ষীরোদ সান্যাল সহ অন্যান্য অধ্যাপকগণ এতে বাধা দেন। অধ্যক্ষকে বাঁচাতে সক্ষম হলেও নিজেরা অল্প বিস্তর আহত হন। এর পরেই মিলিটারীরা কলেজের ভিতর থেকে ছাত্রাবাসের অভিমুখে ধাওয়া করে, ছাত্রাবাসের মূল গেট দিয়ে ঢুকে আরেকদল মিলিটারী ছাত্রদের এলোপাথারি মারতে শুরু করে! একজন ছাত্রকে দোতলা থেকে লাথি মারতে মারতে সিড়ি থেকে ফেলে দেয়। অন্য আর একজন ছাত্র বাঁচার জন্য ঘরের দরজা বন্ধ করেছিল, দরজা ও কাঁচের জানালা ভেঙে তার ঘরে ঢুকে মিলিটারীরা ঘরের ভিতর ভাঙা কাঁচ বিছিয়ে তাকে খালি গায়ে তার উপর শুইয়ে অত্যাচার করতে থাকে। এরপর তার ক্ষতবিক্ষত দেহটি জানালা দিয়ে গলিয়ে নীচে ফেলে দেয়। নীচে ঘাস থাকায় সে প্রাণে বেঁচে যায় কিন্তু সে যখন উঠে পালাতে চেষ্টা করে তখন উপর থেকে তার উপর জলের কুঁজো ছুঁড়ে মারে। আরেকদল মিলিটারী রাস্তায় তিনজন ছাত্রকে লাঠি পেটা করে মাথা ফাটিয়ে দেয় – এই ঘটনাটি ঘটে কলেজ লাগোয়া জেনকিন্স স্কুলের সামনে। এইভাবেই মিলিটারীদের বর্বর অত্যাচারের ফলে ২৬ জন ছাত্র আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্ত্তি হয়। এদের মধ্যে ৬ জনের অবস্থা বেশ গুরুতর ছিল। কলেজে তখন শেষ ঘণ্টা। সুতরাং উপযুক্ত প্রতিরোধের জন্য পর্য্যাপ্ত ছাত্র সংখ্যা উপস্থিত ছিল না। কোচবিহারের জনসাধারণ সুসংহতভাবে এই অমানবিক অত্যাচারের উপযুক্ত জবাব দিয়েছিল। সেদিন কোচবিহার-বাসীদের উল্লেখযোগ্য অংশ যাদের অচলা রাজভক্তি, রাজবাহাদুর রাস্তা দিয়ে যাওয়ার পর তার পাদুকা ধুলিতে গড়াগড়ি দিতে শিখিয়েছিল – অপরাধীদের ধিক্কার জানাতে গিয়ে আহূত জনসভায় সমুদ্রের ঢেউ-এর মতো তারাও এসে সামিল হয়েছিল।

এই পৈশাচিক ঘটনার সাক্ষী হাজার হাজার কুচবিহারবাসী সেদিন রাতেই অ-মানুষিকতার বিরুদ্ধে অধ্যাপক চুনীলাল মুখোপাধ্যায়-এর বাড়ীতে কোচবিহার শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এক সভা থেকে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্য একটি কমিটি গঠন করেন। এই সভার সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়। পাশাপাশি ছাত্রদের একটি সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয় – যার নেতৃত্বে ছিলেন কমরেড কানাই বন্দ্যোপাধ্যায় ও কল্যান দাস।

এই পৈশাচিক ঘটনার প্রতিবাদে কোচবিহারের জনগণ প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে পড়েন। এই জনরোষকে সংগঠিত করার মূল উদ্যোগ নিয়েছিলেন তৎকালীন বেআইনী গোপন কম্যুনিস্ট পার্টি ও ছাত্র সংগ্রাম কমিটির নেতৃত্বরা। ছাত্র সংগ্রাম কমিটি ও কম্যুনিস্ট পার্টির ডাকে ঘটনার পরদিন গোটা কুচবিহার শহরে হরতাল ধর্মঘট পালিত হয়। এটাই ছিল কোচবিহারের ইতিহাসে প্রথম সফল হরতাল ও ধর্মঘট। দ্বি-শতাধিক ছাত্র ও জনতার স্কোয়ার্ড সারা শহর জুড়ে প্রতিবাদের শ্লোগান তোলে এবং দাবী করেন বর্বর মিলিটারীদের বিচার ও শাস্তি।

এই সফল ধর্মঘটে প্রথম সামিল হন শহরের পৌরসভার হরিজন কর্মীরা। বেলা বাড়ার সাথে সাথে এতে যোগ দেন স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রী এবং অফিস কর্মচারীরা। শহরের সমস্ত দোকান পাটও ঐ দিন বন্ধ থাকে ২৪ ঘণ্টার জন্য। ইন্দিরা দেবী স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতি অশোকা রায়কত (বেবী) রাজ পরিবারের ঘনিষ্ঠ ও উমা বসুর (দত্ত) নেতৃত্বে শুধুমাত্র ছাত্রীদের একটা বিরাট মিছিল এই ঘটনার প্রতিবাদে শহর পরিক্রমা করে এবং মিছিলটি লাইনের মাঠে ডাকা প্রতিবাদ সভায় যোগ দেয়। ছাত্রদেরও একটি মিছিল শহর পরিক্রমা করে ঐ সভায় যোগ দেয়। এই প্রতিবাদ সভায় শহরের প্রতি বাড়ী থেকে মানুষ বাড়ী খালি করে যোগ দেন। প্রায় বিশ হাজার মানুষ এই সভায় সামিল হন।

এই ঘটনার সাথে সাথে গোপন কম্যুনিস্ট পার্টি ও ছাত্রফেডারেশনের কর্মীরা হাসপাতালে আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন এবং সমস্ত তথ্য নিয়ে কলকাতা বিশ্বদ্যিালয় কর্তৃপক্ষকে ও ছাত্রফেডারেশনের প্রাদেশিক কমিটিকে জানান। এই খবর পাঠাতে দু'দিন দেরী হয় কারণ, কোচবিহারের পোস্ট অফিস এ খবর রাজ্যের বাইরে পাঠাতে অস্বীকার করে রাজরোষের ভয়ে। ফলে ছাত্রফেডারেশনের কর্মীরা আলিপুরদুয়ার থেকে টেলিগ্রাফ ও চিঠি মারফৎ এই খবর তাদের প্রাদেশিক অফিসে পাঠান।

পরবর্তীকালে ছাত্রফেডারেশনের ডাকে কলকাতা শহরের ওয়েলিংটন স্কোয়ার (অধুনা রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার)-এ প্রায় পনেরো হাজার মানুষের এক প্রতিবাদ সভা হয়। এই বর্বর ঘটনার প্রতিবাদে কোচবিহারের সাধারণ মানুষের সমর্থনে এবং রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা ও মিছিল চলতে থাকে। পাশাপাশি কোলকাতাতে সুধাংশু বক্সীর সভাপতিত্বে পুলকেশ দে সরকার, তারাপদ চক্রবর্তী, প্রেমনীহার নন্দী, অশোক দাশগুপ্ত, রমেন ব্যানার্জী প্রমুখের নেতৃত্বে 'কোচবিহার পিপ্‌লস্ অ্যাসোসিয়েশন' গড়ে ওঠে। এই অ্যাসোসিয়েশনও কলকাতায় কোচবিহারের রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে জনমত গঠনে সোচ্চার হয়। তদানীন্তন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতির অন্যতম সদস্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কাছে এই বর্বর ঘটনার প্রতিকারের উদ্দেশ্যে সহযোগিতা চাইতে গেলে তিনি মন্তব্য করেছিলেন – "আমরা দেশীয় রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে কোন আন্দোলনকে সমর্থন করি না।"

এই ঘটনার সময় কোচবিহারের মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ দিকে বৃটিশ বাহিনীর সাথে মালয়ে ছিলেন। রাজমাতাও ছিলেন রাজ্যের বাইরে। মিলিটারী অত্যাচার-এর কথা শুনে রাজমাতা কুচবিহারে এলে নাগরিক কমিটি তাঁর সাথে দেখা করে। দোষী মিলিটারীদের প্রকাশ্য বিচার ও শাস্তি দাবী করে। রাজমাতা মিলিটারীদের অত্যাচারের কথা সরাসরি অস্বীকার করলে নাগরিক কমিটি ও ছাত্র সংগ্রাম কমিটি চ্যালেঞ্জ করে আবার একটি জনসভা ডাকে এবং সেখানে রাজমাতার উপস্থিতি দাবী করে। পরের দিন আবার বিশাল ছাত্র ও নাগরিক মিছিল শহর পরিক্রমা করে জনসভার আহ্বান জানায়। সমস্ত কুচবিহার ফাঁকা করে নির্ধারিত দিনে বিশ হাজার মানুষের জমায়েত করে লাইনের মাঠে। এই সভায় রাজমাতার প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজার ADC (গৃহমন্ত্রী) রাজেন সিং। এই সভার সভাপতি ছিঁলেন অধ্যাপক চুণীলাল মুখোপাধ্যায় এবং মূল বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক দুর্গাকিঙ্কর ভট্টাচার্য প্রমুখ বিশিষ্ট নাগরিক ও ছাত্রী নেতৃবৃন্দ। উক্ত সভায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে দুর্গাকিঙ্কর ভট্টাচার্য ঐ ঘাতকদের বিরুদ্ধে মন্তব্য করেছিলেন – 'Pantered brutes of the Coochbehar State Force'. সেই সভায় উপস্থিত রাজার গৃহমন্ত্রীর গৌর মুখমণ্ডল ক্রোধে রক্তিম হয়ে উঠেছিল কারণ রাজাই ছিলেন জোয়ান বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। সেদিন কুচবিহারের প্রতিটি মানুষের মনে আক্রমণকারীদের প্রতি ঘৃণা ও আক্রান্তদের প্রতি অপরিসীম সহানুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটেছিল। সমস্ত পথই গিয়ে মিশেছিল হাসপাতালে। ফুল, ফল, অর্থ নিয়ে উদ্বেগে আকুল মানুষের দিনরাত্রি পথ চলা, এমনকি দীনদরিদ্র রিক্সাচালক পর্যন্ত হসপাতাল যাত্রীর কাছ থেকে ভাড়া নিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। এই পৈশাচিক ঘটনার প্রভাব গোটা রাজ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল।

এই পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়েই রাজমাতা অবশেষে দোষী মিলিটারীদের প্রকাশ্য বিচার ব্যবস্থায় রাজী হন। বিচারে কুমার পূর্ণেন্দু নারায়ণসহ ১০৫ জন দোষী মিলিটারীর জেল হয়। কুচবিহারের ইতিহাসে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের গণজাগরণের এক বিরাট সাফল্য অর্জিত হল।

রাজশক্তি সাময়িকভাবে এই বিচারের মধ্য দিয়ে পিছু হটলেও প্রজাদের বিরুদ্ধে তাদের অত্যাচারের অস্ত্র শাণিত করতে থাকে। এর নজির হিসাবে আমরা দেখি মাত্র দেড় বছরের মধ্যেই গড়ে ওঠা ঐ গণ আন্দোলন ও বেআইনী কম্যুনিস্ট পার্টিকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য প্রচেষ্টায়। এই সময়েই রামভোলা স্কুলের শিক্ষক সরোজ ভট্টাচার্য, বীরেন্দ্র চন্দ্র দে সরকার সহ আরও অনেকের ২৪ ঘন্টার মধ্যে কুচবিহার ছাড়ার নির্দেশ হয়। এই আন্দোলনের বিজয়ের পরেই কোচবিহারের মানুষ ব্যক্তি স্বাধীনতা ও অধিকার অর্জনের আন্দোলন করতে সমর্থ হন।

এই সময়কাল থেকেই কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ছাত্রসমাজ ও জনগণের বিভিন্ন আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। এই আন্দোলনগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল – আজাদ্হিন্দ ফৌজের নেতা জেনারেল শাহ-নওয়াজ খানের মুক্তির দাবীতে আন্দোলন, রসিদ আলি দিবস-এর আন্দোলন ও কাশ্মীরে ডোগরা রাজতন্ত্রবিরোধী সংগ্রামের সমর্থনে আন্দোলন। পাশাপাশি ছাত্র ও জনগণের অন্যান্য অংশে বিভিন্ন সংগঠনগুলি প্রকাশ্যেই তৈরী হতে শুরু হয়।

ব্যক্তি স্বাধীনতার আন্দোলনের গতি ঃ

ভারতের কয়েকটি দেশীয় রাজ্যে বিশেষতঃ কাশ্মীরের ডোগরা রাজার বিরুদ্ধে যখন বিদ্রোহ শুরু হয় সেই সময় কুচবিহারেও প্রজা আন্দোলন শুরু হয়। '৪৬-এ "প্রজামণ্ডল" সংগঠনের নামে এই জেলার কয়েকটি গ্রামে প্রজাদের (কৃষক) সংগঠিত করার কাজ চলতে থাকে। তবে প্রকাশ্যে একাজ করা যেত না। অপ্রকাশ্যে বা অর্ধপ্রকাশ্যে প্রজা আন্দোলন সংগঠিত হতে থাকে। এই প্রজা আন্দোলনের বক্তব্য তখনকার কোচবিহারবাসীর মনে সাড়া জাগাতে থাকে। তাই রাজতন্ত্র বিরোধী গণতন্ত্রের বিকাশ সহ্য করতে না পেরে আনসারউদ্দীন, আমানতুল্লা, জলধর সাহা, ধরণীশঙ্কর ভট্টাচার্য, সতীশ রায় সিংহ – এই রাজ্যের রাজভক্ত জোতদাররা রাজতন্ত্রকে শেষবারের মতো রক্ষার জন্য –"হিতসাধনী সভা" নামে একটি সংগঠনের জন্ম দেয়। এই সংগঠনের প্রধান কাজ ছিল জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা। 'দেশী ভাটিয়া' জিগীর তুলে স্থানীয় রাজবংশী সম্প্রদায়ের সঙ্গে অন্যদের বিরোধ সৃষ্টির চক্রান্ত করে কৃষক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ফাটল ধরানোর চেষ্টা চালাত। এ ভাবেই রাজতন্ত্র ও সামন্ত ভূমি ব্যবস্থা রক্ষায় অন্তিম চেষ্টা চালিয়েছিল - যার রেশ এখনো চলছে উত্তরখণ্ডের আন্দোলন – বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মদতে।

এখানে কোন জমিদার ছিল না, রাজাই একমাত্র জমিদার, তার নীচে ছিল জোতদার, তার নীচে চুকানিদার এবং তার নীচে দরচুকানি। এই চার-পাঁচটি নিম্ন সত্ত্বাভোগীদের নিয়ে ছিল রাজার মালিকানা। 'বেঙ্গল টেনান্সি অ্যাক্ট' এখানে চালু ছিল না। রাজার দরবারে পাশ করা জমির আইন এখানে কার্যকর হ'ত। এখানকার লোকসংখ্যা ছিল সাতলক্ষের মতো – (ভারতভুক্তির আগে)। দেশ ভাগের ফলে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত লোকের ভিড়ে ক্রমশঃ লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখানকার কৃষি উৎপাদনের পদ্ধতি ছিল সেকেলে। গ্রামগুলির চেহারা ছিল এরকম – জোতদারের বড় বাড়ী এবং তারই চারপাশে ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর। ভাগচাষ প্রথাই এখানকার প্রধান চাষের প্রথা। ভাগচাষীদের এখানে স্থানীয়ভাবে 'হালুয়া' বলা হ'ত। হালুয়াদের জীবনযাত্রার মান খুবই নিম্নস্তরের। কোনরকমে একখানা ঘর তাও জোতদারদের বাড়ির চালার মধ্যে। প্রায় অর্ধ উলঙ্গ অবস্থায় এরা

থাকত। মেয়েদের পরনে থাকত 'পাটানি' অর্থাৎ শাড়ি বা কাপড় দু'ভাঁজ করে বুকের উপর বেঁধে রাখত। গায়ে জামা থাকত না। বেশভূষা এবং খাদ্যের অতি দীন অবস্থা ছিল। শিক্ষা ছিল না, ছিল না কথা বলার অধিকার। হালুয়াদের মানসিকতা ছিল - গিরি-ই বাবা, মা তাই গিরির বিরুদ্ধাচারণ করা যাবে না। সে সময় শিক্ষিতের হার ছিল ৮-১০ ভাগ ও পাগলের সংখ্যা ছিল ৩-৪ ভাগ।

চূড়ান্ত পশ্চাদ্‌পদতা, দারিদ্র, গোলামীর মানসিকতা থেকে কোচবিহার-এর জনগণকে ক্রমাগত মুখর ও সক্রিয় করে তোলা, গণতান্ত্রিক চেতনায় উন্নীত করার কাজে এখানকার ছাত্রসমাজই প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। গোপন কাজের মধ্য দিয়ে এই জেলার ছাত্র আন্দোলনের গোড়াপত্তন। রাজশক্তিকে এড়িয়ে চলা, তার অনুশাসনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে কাজ করা অর্থাৎ ছাত্র আন্দোলনের কর্মীদের আত্মগোপন করেই কার্যতঃ কাজ করতে হ'ত। ছাত্ররা গ্রামে গ্রামে যেত। সচেতনতার আন্দোলনের পাশাপাশি হালুয়াদের সচেতন করত এবং তারা কি করে জমি পাবে এবং জোতদার প্রথার কি করে উচ্ছেদ হবে, গোলামী থেকে মানুষের কি করে মুক্তি আসবে– এই সমস্ত নিয়ে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল। অশিক্ষা, কুসংস্কার ও পশ্চাৎপদতার সুযোগ নিয়ে গ্রামের দেওয়ানী (মাতব্বর) সাধারণ মানুষের উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই দেওয়ানীতন্ত্র ভাঙ্গাও ছিল তখনকার ছাত্র আন্দোলনের অপর প্রধান কাজ। তখনকার একটি প্রচলিত গানের কলিতে কোচবিহারের মানুষের প্রকৃত মানসিকতার পরিচয় মেলে। সেই গানের কলিটি সুন্দর – "কমু বা কার নাম ভাইরে কমু বা কার নাম/ দেওয়ানী, ডাক্তার, উকিল, মোক্তার ....।" হাটের ইজারাদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গ্রামে গ্রামে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছিল। ফলে কয়েকটি বড় বড় হাটে অন্যায়ভাবে নিরীখনামা বা 'হাটের তোলা' আদায় প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। হাটের ইজারাদারদের উদ্দেশ্যে ছাত্ররা গান বেঁধেছিল – "ত্যাল চক্‌চক্‌ দোটা, নাকডাঙরার ব্যাটাটা/মোক্ ভুলালু নিরীখ না দ্যাখেয়া রে, নিরীখ না দ্যাখেয়া।" ১৯৪৬ সালে মেখলিগঞ্জের ধুলিয়া উছলপুকুরীতে "যে কৃষক জোতদারের জমি নিজের গরু দিয়ে চাষ করবে সে বছরে ১২ মন ধান পাবে" অর্থাৎ 'পানা' পাবে– এই দাবীতে সেখানে তুমুল প্রজা আন্দোলন গড়ে ওঠে এবং কুচবিহার রাজ্যের মধ্যে কৃষকরা ধুলিয়া ইছলপুকুরীকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করে। কৃষকরা সেখানকার চাষী দীনেশ্বরকে স্বাধীন উছলপুকুরীর রাজা ঘোষণা করে। এই আন্দোলনকে সফল করতে তৎকালীন ছাত্রফেডারেশন যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল। পরবর্তীকালে কৃষকদের ১২ মন পানা পাবার অধিকার 'কুচবিহার কাউন্সিলে' অনুমোদিত হয়।

ছাত্র ফেডারেশনে মতাদর্শগত বিতর্কের সূত্রপাত ঃ

জন্মলগ্ন থেকেই নানা পথ ও নানা মত-এর অনুগামী নানা রাজনৈতিক প্রজা ও দলের ছাত্ররা ছাত্রফেডারেশনে থাকবার ফলে AISF এর মধ্যে বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী মতাদর্শগত বিরোধের সৃষ্টি হয়। জাতীয় আন্দোলনে যখন এ রকম বিতর্ক তীব্র হয়েছে তখন এই বিতর্কের হাওয়া ছাত্র ফেডারেশনের মধ্যে এসে পড়েছে। ১৯৩৬ সালে ছাত্রফেডারেশনের জন্মের পর থেকে AISF এর নেতৃত্বে বড় বড় সংগ্রাম দেশজুড়ে পরিচালিত হচ্ছিল। ঠিক পাশাপাশি কংগ্রেসের মধ্যে, দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থীদের মধ্যে বিরোধের তীব্র চেহারা আত্মপ্রকাশ করতে থাকে একই সময়ে। এই বিরোধ চরম আকার নেয় ১৯৩৮-এর কংগ্রেসের হরিপুরা অধিবেশনে সভাপতি নির্বাচনকে

কেন্দ্র করে। এই অধিবেশনে বামপন্থীদের সমর্থিত প্রার্থী সুভাষচন্দ্র বসু গান্ধী সমর্থিত পট্টভি সীতারামাইয়াকে পরাজিত করে কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। বেআইনী কম্যুনিস্ট পার্টি ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের আদর্শে বিশ্বাসী সমস্ত রাজনৈতিক দলই সুভাষচন্দ্র বসুকে সমর্থন জানিয়েছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে – ১৯৩৪ সালে কম্যুনিস্ট পার্টি বেআইনী ঘোষণা করা সত্ত্বেও শ্রমিক, কৃষক সংগঠনগুলি ছাত্র ফেডারেশনের মাধ্যমে ক্রমাগত সংগঠিত করতে পার্টি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। হরিপুরা অধিবেশনের আগেই AISF-এর মাদ্রাজে তৃতীয় সম্মেলনে সভাপতিত্ব করতে ডাকা হয়েছিল কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টির নেতা মিনু মাসানীকে। বিতর্ক আত্মপ্রকাশ করল – সোভিয়েত ইউনিয়নের নতুন সংবিধান যেখানে শিক্ষা ও কাজের অধিকারকে মৌলিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল – তাকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রস্তাব আনার প্রস্তাবে। মাসানী প্রতিনিধিদের সেই প্রস্তাব আনতে বাধা দেন কিন্তু সেই বাধা টেকেনি। পরবর্তীতে মতাদর্শগত বিতর্কের প্রথম পর্যায়ে জয়যুক্ত হয়েছিল সমাজতন্ত্রের পথে অনুগামী ছাত্ররাই।

এই বিতর্ক আবার আত্মপ্রকাশ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধবার পর। এই বিতর্ককে দু'টি পর্যায়ে ভাগ করা যায় – প্রথমটি বিশ্বযুদ্ধের শুরু অর্থাৎ ১৯৩৯-এর ২রা সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৪১-এর ২১শে জুন – সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হওয়ার আগে পর্যন্ত। দ্বিতীয় পর্যায়ে – সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হওয়ার পর থেকে বিশ্বযুদ্ধের অবসান পর্যন্ত। বিশ্বযুদ্ধ যখন শুরু হয় তার আগেই দক্ষিণপন্থীদের মিলিত আক্রমণের চাপেই সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেস-এর সভাপতিত্ব ছাড়তে বাধ্য হন। যে জহরলাল নেহেরু এতদিন পর্যন্ত সমাজতন্ত্র ও বামপন্থার পক্ষে দাঁড়িয়ে দৃঢ় মত ব্যক্ত করে এসেছেন তিনি সেই সময় কিন্তু সুভাষচন্দ্রের পাশে এসে দাঁড়ান নি। জাতীয় আন্দোলনে নেহেরুর বিশ্বাসঘাতকতার পর্বের শুরু এখান থেকেই। অর্থাৎ দেখা গেল বিশ্বযুদ্ধ শুরুর আগেই কংগ্রেসের মধ্যে দক্ষিণপন্থীদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, কংগ্রেস আর সব দলের মানুষের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের এক সাধারণ মঞ্চ হিসাবে থাকতে পারছে না।

ইতিমধ্যে একটি অশুভ দিক সূচিত হল। মুসলিম লীগের নেতৃত্বে ১৯৪০-এ সারাভারত মুসলীম ছাত্রলীগ গঠিত হল। বাংলায় মুসলীম ছাত্রলীগ অবশ্য ১৯৩৭ সালে আলাদা করে গঠন করা হয়েছিল। তৎকালীন ছাত্রফেডারেশনের নেতৃত্ব ও কর্মীরা চেয়েছিলেন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে সমস্ত মতাদর্শের ছাত্রদের ঐক্যবদ্ধ করে কার্যক্রমে সামিল করতে। যেমন – বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে ১৯৪০-এর জুলাই মাসের শুরু থেকেই সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে হলওয়েল মনুমেন্টের অপসারণের দাবীতে ঐতিহাসিক আন্দোলন। এই আন্দোলনের নেতা সুভাষচন্দ্রকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে তুমুল ছাত্র আন্দোলন গোটা বাংলাদেশে গড়ে উঠেছিল। তার ঢেউ কুচবিহার-এর ছাত্র আন্দোলনেও আছড়ে পড়েছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হওয়ার পর এই যুদ্ধের চরিত্রের মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছিল। গোটা পৃথিবীর সঙ্গে ভারতের ভাগ্য ও ফ্যাসীবাদের পরাজয় ও সমাজতান্ত্রিক জয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছিল। এখানকার কম্যুনিস্ট পার্টিও এই যুদ্ধকে জনযুদ্ধ বলে আখ্যা দিয়েছিল এবং বলা হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নে যোগদানের মধ্য দিয়ে যুদ্ধের চরিত্রের একটি মৌলিক

পরিবর্তন ঘটেছে। কম্যুনিস্ট পার্টি শ্লোগান দিয়েছিল– এই যুদ্ধে ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের উপরই নির্ভর করছে ভারতের মতো ঔপনিবেশিক দেশগুলি তাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করবে কি না। নিছক বৃটিশ বিরোধীতার নামে ফ্যাসিস্টদের বিজয়, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যে ভাবেই সাহায্য করা হোক না কেন তা হবে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি অপরাধ। একদিকে যেমন সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজয়ের জন্য সর্বশক্তি দিয়ে মানুষকে জড়ো করতে হবে, অন্যদিকে তেমনি জাতীয় সরকার গঠনের জন্য সাম্রাজ্যবাদী সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে। কম্যুনিস্টদের এই শ্লোগানে অনেক সংশয় থাকলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানে ভাতবর্ষের উত্তাল স্বাধীনতা আন্দোলনের ঘটনায় এই শ্লোগানের সত্যতা প্রমানিত হয়েছিল।

আজও ছাত্রফেডারেশন ও কম্যুনিস্টদের '৪২-এর আগস্ট আন্দোলনে ভূমিকা নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে নানা কুৎসা রটনা করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হল – একদিকে AISF যেমন ফ্যাসীবাদের পরাজয়ের জন্য একমাত্র ছাত্রসংগঠন তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে পাশাপাশি ঠিক একই সময়ে জাতীয় সরকার গঠন ও ধৃত জাতীয় নেতাদের মুক্তির দাবীতে ধারাবাহিকভাবে আন্দোলন সংগ্রাম চালিয়ে গেছে। এই কাজের জন্য AISF, কংগ্রেস ও মুসলীম লীগ ঐক্য এবং সমস্ত অংশের ছাত্ররা ঐক্যের শ্লোগান দেয়। আগস্ট আন্দোলনের তীব্রতা কার্যতঃ '৪২-এর মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে কংগ্রেস ও অন্যান্যরা এরপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের জন্য কোন গঠনমূলক কর্মসূচী নেয় নি। ঐ সময়কালে ছাত্রফেডারেশন ও কম্যুনিস্ট পার্টি কর্তৃক প্রভাবিত সংগঠনগুলির বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করাই কংগ্রেস ও লীগের (মুসলীম লীগ) একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়ায়। এই অবস্থার মধ্যে AISF সমস্ত দিক থেকে আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে ছাত্র ঐক্য গড়ে তুলতে থাকে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানে আসন্ন স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য ছাত্রসমাজকে প্রস্তুত করতে থাকে। এই সময় বাংলাদেশ সাম্রাজ্যবাদী নীতির দরুণ এক ভয়ানক দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হয়। সেই সময়ে ছাত্রফেডারেশনের উদ্যোগে বহু ত্রাণ শিবির গড়ে ওঠে এবং ছাত্রকর্মীরা সাংস্কৃতিক দল গঠন করে, নানা জাতীয় অনুষ্ঠান করে অর্থ সংগ্রহ করে গেছেন দুর্ভিক্ষ মোকাবিলা করার জন্য। দুর্ভিক্ষ বিরোধী এই অভিযান ছাত্রফেডারেশনকে সাধারণভাবে ছাত্রসমাজ ও জনসাধারণের মধ্যে জনপ্রিয় হতে সাহায্য করেছিল। পাশাপাশি ছাত্রফেডারেশনের কর্মীরা 'যুদ্ধ যে জনযুদ্ধ' এই দৃষ্টিভঙ্গী ব্যাখ্যা করার সুযোগ এনে দিয়েছিল। এই বিশেষ ঘটনা তৎকালীন জাতীয় জীবনে AISF-এর দেশপ্রেমিক ভূমিকা, মর্যাদা ও বিশ্বাসযোগ্যতাকে সপ্রমান করেছিল।

স্বাধীনতার চূড়ান্ত সংগ্রাম : কোচবিহারের ছাত্র আন্দোলনে নতুন অনুপ্রেরণা :

'৪৫ সালে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের গণজাগরণের এক বিরাট সাফল্য অর্জিত হবার পর কোচবিহারের মানুষ ব্যক্তি স্বাধীনতা ও অধিকার অর্জন করতে সমর্থ হন। তখন থেকেই কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ছাত্রসমাজ ও জনগণের বিভিন্ন আন্দোলন দানা বাঁধে। এই আন্দোলনগুলির অন্যতম ছিল আজাদ্ হিন্দ ফৌজের নেতা জেনারেল শাহ নওয়াজ খানের মুক্তির দাবীতে আন্দোলন,

রসিদ আলি দিবসের আন্দোলন ও কাশ্মীরের ডোগরা রাজতন্ত্র বিরোধী আন্দোলন। ছাত্র আন্দোলন ও জনগণের অন্য অংশে ব্যক্তি স্বাধীনতার আন্দোলনের পাশাপাশি ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য বিভিন্ন সংগঠনগুলি প্রকাশ্যেই তৈরী হতে শুরু করে। স্বাধীনতার প্রাক্‌মুহূর্তে সংগঠিত, পরিকল্পিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় এখানকার শান্তি বজায় রাখার জন্য এখানকার ছাত্রফেডারেশনের কর্মীরা চেতনায় শান দিয়ে নিজেদের নিয়োজিত করেছিল। অবশেষে বহু রক্ত, ঘাম ও আত্মত্যাগের বিনিময়ে বহু প্রতিক্ষিত ভারতভূমির স্বাধীনতা এল '৪৭-এর ১৫ই আগস্ট। কিন্তু এদিকে শুরু হল কুচবিহারের রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে ব্যক্তি স্বাধীনতার সংগ্রাম। এই ব্যক্তি স্বাধীনতা সংগ্রাম কমিটি গঠন করেছিল তৎকালীন কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে ছাত্রফেডারেশনের কর্মীরা। এর নেতৃত্বে ছিলেন অধ্যাপক দুর্গাকিঙ্কর ভট্টাচার্য। '৪৭-এর ১৫ই আগস্ট দু'দিন কুচবিহার রাজ্যের নিয়মকানুন কিছুটা শিথিল করা হয় এবং এই সময়েই অধ্যাপক ভট্টাচার্য তৎকালীন ছাত্রনেতা বীরেন্দ্র চন্দ্র দে সরকার (রবি)-কে সম্বর্ধনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে একটি সভা ডাকেন। কুচবিহার রাজ্য থেকে বহিষ্কৃত রবি সেই সময় লালমনি হাট থেকে কোচবিহারে পৌঁছান। কুচবিহারে পৌঁছানোর পর শহরের কয়েকটি চৌমাথায় পথসভা সংগঠিত করেন। তারপর পুনরায় কোচবিহারের রাজা রবি দে সরকার-এর উপর বহিষ্কারের আদেশ জারি করেন। এর পরই অধ্যাপক দুর্গাকিঙ্কর ভট্টাচার্যকে ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে বরখাস্ত করা হয়। এর প্রতিবাদে তৎকালীন ছাত্রনেতৃত্ব শিবেন চৌধুরী, দেবীদাস লাহিড়ী, হরিদাস মুখার্জী ও নিখিল চক্রবর্তী সহ মোট ৬ জন কোচবিহার ল্যান্সডাউন হলে অনশন ধর্মঘট করেছিলেন। সে সময় কোচবিহারে যে সর্বাত্মক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তা তৎকালীন বাংলার প্রতিটি প্রান্তে তরঙ্গের মতো সাড়া জাগিয়েছিল। আজ তা অতীতের বিস্মৃত প্রায়। এই সময় ছাত্র আন্দোলনের সামনে সম্ভাবনা, দ্বিধা-দ্বন্দের নতুন নতুন প্রশ্নগুলি খুব দ্রুততার সঙ্গে আসতে লাগল।

ছাত্র আন্দোলন কোন পথে যাবে? ঃ

দেশ স্বাধীন হবার আগেই একাধিক ছাত্র সংগঠন সৃষ্টি হয়েছিল। স্বাধীনতার প্রাক্‌পর্বে ছাত্র আন্দোলনের ধারাকে অনুসরণ করলে দেখা যাবে যে AISF-এর জন্মের কিছু পর থেকে সংগঠনের ভিতর নানাভাবে মতাদর্শগত বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পরবর্তী যুগে ছাত্রআন্দোলনের সামনে যে বিতর্ক উপস্থিত হয় তা আগের পার্থক্যগুলি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। স্বাধীনতার পরবর্তী যুগের ছাত্র আন্দোলনকে বুঝতে গেলে স্বাধীনতার আগে ও পরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠীগুলির অবস্থান ভালভাবে বিচার করা দরকার। অনুসন্ধান করা প্রয়োজন কি ভাবে আমাদের স্বাধীনতা এল।

১। প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে এবং তারা প্রধানতঃ সমাজের যে সমস্ত অংশের প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন তাদের মধ্যকার অবসস্থানের নানা পার্থক্য ছিল। দেশের সাধারণ মানুষ যে অর্থে স্বাধীনতাকে বুঝতে চেয়েছিলেন সমাজের মুষ্টিমেয় ধনীকশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে তা সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না।

২। সাম্রাজ্যবাদ সাধারণ শত্রু হিসাবে থাকবার ফলে মতপার্থক্য ঢেকে দিয়ে বৃহত্তর ঐক্যের একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল।

৩। বিভিন্ন মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও স্বাধীনতার জন্য ঐক্যবদ্ধ ছাত্র আন্দোলন গড়ে তুলতে বিভিন্ন বাধা উপস্থিত হলেও উত্তাল সংগ্রামের সময় সেই বাধাগুলি কেটে যেত।

স্বাধীনতার দিন যতই এগিয়ে আসতে লাগল ততই আমাদের সমাজ জীবনের ভিতর এইসব সংঘাতগুলি প্রকাশ পেতে শুরু করল। প্রশ্নগুলো এইরকম –

(ক) ভারতের স্বাধীনতার ফল কে ভোগ করবে?

(খ) ভারতবর্ষের অগণিত শ্রমজীবি মানুষের স্বার্থে এই স্বাধীনতা কাজে লাগানো হবে না ভারতবর্ষের মুষ্টিমেয় ধনীকশ্রেণীর নিজস্ব সম্পত্তি বাড়ানোর স্বার্থে এই স্বাধীনতাকে কাজে লাগানো হবে।

এখন প্রশ্ন হল দেশের সর্বস্তরের জনগণের নিজস্ব দাবী-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন সংগঠিত করার প্রয়োজন আছে, না এখন আমাদের সবকিছু নতুন সরকারের হাতে ছেড়ে দিয়ে বসে থাকতে হবে। ঠিক এই প্রশ্ন ছাত্র আন্দোলনের সামনে বড় হয়ে দেখা দেয়।

জাতীয় কংগ্রেসের যে সমস্ত নেতা স্বাধীনতার পূর্বযুগে বলতেন 'ছাত্রদের অতি অবশ্যই উন্নত শিক্ষার জন্য ও উন্নত জীবনের জন্য শুধু সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামেই নয়, সামগ্রিক রাজনৈতিক জীবনেও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে, শুধু দেশ নয় অনুসন্ধান করতে হবে সারা বিশ্বরাজনীতির গতি প্রকৃতিকে' – দেখা গেল তারাই স্বাধীনোত্তর যুগে বলতে শুরু করলেন, ছাত্রদের সংগঠন হবে সম্পূর্ণ অ-রাজনৈতিক। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে ১৯২৮ সালে পণ্ডিত নেহেরু বলেছিলেন –"তোমরা কি সারা পৃথিবীর তরুণ তরুণীর কাঁধে কাঁধ দিয়ে লড়তে রাজী আছ? শুধু তোমাদের স্বদেশ থেকে উদ্ধত বিদেশী রাজাকে উচ্ছেদ করার জন্যই নয়, এই দুর্ভাগা জগৎকে বদলে উন্নততর সুখী সমাজ গঠনের জন্য লড়তে কি তোমরা রাজী? .... তোমাদের যদি আদর্শ হয় সামাজিক সমান অধিকার ও বিশ্বমৈত্রী তাহলে তোমাদের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য লড়তে হবে।" সেই নেহেরুই '৫০ সালে কংগ্রেসের উদ্যোগে National Union of Students-এর উদ্বোধনী সম্মেলনে বললেন যে – "ছাত্রদের দেশ ও বিশ্বরাজনীতি নিয়ে আদৌ মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই, একমাত্র কাজ ভাল করে লেখাপড়া করা।" এইভাবে অবস্থার পরিবর্তন কেন হল? তার কারণ কংগ্রেস নেতৃত্ব বরাবরই চেয়েছিলেন ভারতবর্ষে পুঁজিপতি ও উচ্চ শ্রেণীগুলির প্রতিনিধিদের হাতে শাসনক্ষমতা ন্যস্ত করতে। স্বাধীনতার প্রাকযুগে দেশের উন্নয়নের পথে প্রধান বাধা ছিল বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ। তাই সাম্রাজ্যবাদীদের কাছ থেকে ক্ষমতা অধিকার করার প্রয়োজনে ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষের সংগ্রামী ক্ষমতাকে তারা ব্যবহার করেছে। অপরদিকে ছাত্রসমাজ তাদের সংগ্রামী ক্ষমতাকে মানুষের স্বার্থে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছিল এবং স্বাধীনতার যুগে ছাত্রদের নেতৃত্বে জঙ্গী আন্দোলন গণসংগ্রামের চেহারা নিয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের মোকাবিলায় এগিয়ে এসেছিল।

নেহেরু সরকারের নীতি ও নতুন যুগের ছাত্র আন্দোলনের পটভূমি :

পণ্ডিত নেহেরুর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকার স্বাধীনতার পরদিন থেকেই ছাত্রসমাজ এবং জনগণের সব গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলিকে সাহায্য করার কোন প্রচেষ্টা তো করেই নি বরং তাকে স্তব্ধ করার জন্য নানা প্রচেষ্টা চালিয়েছে। ঔপনিবেশিক শাসনের অবশেষগুলিকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করার বদলে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর সঙ্গে আপোস করেছে। ধনীক শ্রেণীর আরো সমৃদ্ধির জন্য তাদের স্বার্থেই বিভিন্ন ধরণের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। স্বাধীনতার জন্য জনগণের যে আত্মত্যাগ, শ্রমজীবী ও সাধারণ মানুষের যে আশা-আকাঙ্খা তার সঙ্গে এই সমস্ত ব্যবস্থা সংগতিপূর্ণ ছিল না। সেদিন ধনতন্ত্র সম্পর্কে নেহেরুর মন্তব্য ছিল – "বর্তমান পৃথিবীর আরো অগ্রগতির পথে ধনতন্ত্র একটি বিপজ্জনক বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অতএব, এখন সম্পদের উপযুক্ত বণ্টনের সমস্যাটি সমাধানের জন্য প্রয়োজন সমাজতন্ত্রের।" অথচ স্বাধীনতার পরবর্তীতে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইলেন ধনতন্ত্রের পথে। ফল হিসাবে সার্বজনীন শিক্ষাসমেত সর্বস্তরের জনগণের দারিদ্রের অবসানের জন্য যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দেশবাসীর কাছে দেওয়া হয়েছিল কার্যক্ষেত্রে কংগ্রেস সরকার জন্মলগ্ন থেকেই তার বিপরীত কাজ করতে শুরু করলেন। আপোস করা হল শুধু সাম্রাজ্যবাদের সাথেই নয় অগণিত দরিদ্রের স্বার্থকে জলাঞ্জলী দিয়ে ক্ষমতার অংশীদার করা হ'ল এদেশীয় জমিদারদের। ভারতবর্ষের জনগণের স্বার্থ আর মুষ্টিমেয় ধনিক শ্রেণীর স্বার্থ যে কখনো একসাথে রক্ষা করা যায় না দৈনন্দিন জীবনে তা কম-বেশী প্রত্যক্ষ করতে শুরু করল কুচবিহারবাসী।

'৪০-এর দশকে জম্মু-কাশ্মীর থেকে উড়িষ্যার ঢেনকানল রাজ্যের প্রজাদের আন্দোলন, কৃষক সমাজের আন্দোলনে এক গৌরবজনক ইতিহাস রচনা করে। এই দশক-এর মাঝামাঝি দেশীয় রাজ্য কোচবিহারে এই আন্দোলন ব্যাপক হয়। এই সময়ই একদিকে নিজামশাহীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে তেলেঙ্গানার বিদ্রোহ এত ব্যাপকতা লাভ করেছিল যে তার ঢেউ এখানকার ছাত্রসহ সাধারণ নাগরিক জীবনেও আছড়ে পড়েছিল। কাশ্মীরের দেশীয় রাজ্যের আন্দোলনকে সহানুভূতি জানাতে গিয়ে নেহেরু গ্রেফ্‌তার হয়েছিলেন, অনুরূপভাবেই কোচবিহারের অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রীকে পুলিশের হাতে লাঞ্ছিত হতে হয়েছিল। কারণ বৃটিশ সরকার দেশীয় রাজাদের, নবাবদের সর্বতোভাবে সমর্থন করত। এই সূত্রে কোচবিহারের ছাত্র আন্দোলন সারা বাংলার ছাত্র আন্দোলনের সাথে আরেকটি ধারাতেও প্রবাহিত হয়। এই ধারাটি ছিল দেশীয় রাজাদের যে অকথ্য অত্যাচার চলত তার বিরুদ্ধে আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আরেকটি আন্দোলন। তার বক্তব্য ছিল – "আমরাও ভারতের অঙ্গ, সাধারণ ভারতের নাগরিকদের সঙ্গে একই সূত্রে একই সাধারণ স্রোতে আমরা একত্রিত হতে চাই।" দুই ধরণের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে দেশীয় রাজ্যের ছাত্রদের লড়াই চালাতে হয়েছে। সেই সময় ছাত্র আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বিমল মুস্তাফী, বিনয় ভৌমিক, বিমল সেনগুপ্ত (মাধু), মধু সেনগুপ্ত, অনিল রায় (প্রজামণ্ডল), মনমোহন সেন (বর্তমানে CPI নেতা), সরোজ ভট্টাচার্য, দেবীদাস লাহিড়ী প্রমুখ ছাত্রনেতৃত্ব।

The Cooch Behar Gazette.

১৪ই কার্তিক শনিবার] SATURDAY, NOVEMBER 1, 1947. [১৩৫৪ সাল, ৪৩৮ রাজশক

Part II B.

Police Supp'ement.

The "General Notice under section 26(2) of the Cooch Behar Police Act III of 1898" published in Part II B of the *Cooch Behar Gazette* of October 16, 1947, is cancelled and the following fresh notice is issued :—

"General Notice under section 30(2) of the Cooch Behar Police Act 1947."

Whereas I, the Commissioner of Police, Cooch Behar, am satisfied that it is intended by certain persons or class of persons to convene or collect assemblies or to form processions on the public roads or in the public streets or thoroughfares in the Towns of Cooch Behar, Dinhata, Tufangunj, Mathabhanga, Mekligunj and Haldibari.

And whereas such assembly or procession, if uncontrolled, would be likely to cause a breach of peace ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 30 of the Cooch Behar Police Act, I do hereby require the persons convening or collecting such assembly or directing or promoting such procession to submit to me, at least 5 days before any date that may be fixed for such assembly and procession, the times of such assembly and procession, the place at which such assembly will meet or from which such procession will start, the route by which such procession will pass and the number of persons who are likely to attend such assembly or to take part in such procession, together with all other details required to be included in such license. This order will remain in force for three months from the date of issue.

J. M. CHATTERJEE,
Commissioner of Police.
Cooch Behar.

কুচবিহারের ভারত ভুক্তিকরণ ঃ

'৪৭ সালে ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে দ্বিখণ্ডিত ভারত যখন স্বাধীন হয় তখন সপরিষদ সামন্তরাজা একই ভাষাভাষি মানুষের কাছ থেকে এই রাজ্যকে বিচ্ছিন্ন রাখার ঘৃণ্য চক্রান্ত তিনবছর ধরে চালিয়ে যায়। রাজতন্ত্রের অবসানের জন্য এ রাজ্যে যখন 'প্রজামণ্ডল' গড়ে ওঠে তখন রাজতন্ত্রের 'সেফটি ভালভ্' হিসাবে প্রজামণ্ডলের সমান্তরাল সংগঠন 'হিতসাধনী সভা' গড়ে উঠেছিল। আনসারউদ্দিন, আমানাতুল্লা, জলধর সাহা, ধরণীশঙ্কর ভট্টাচার্য, সতীশ রায় সিংহ- এরা রাজপরিবারের ঘনিষ্ঠ 'হিতসাধনী'-র নেতা ছিলেন। এরা চেয়েছিলেন কোচবিহার রাজ্য পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হোক, অন্যথায় কুচবিহার ভারতভুক্ত হলে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত না হয়ে আসামের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পক্ষপাতি ছিলেন। কিন্তু এই রাজ্যের ছাত্রসহ আপামর জনগণই দুর্বার আন্দোলনের মাধ্যমে ১৯৪৯ সালের আগস্ট মাসে কোচবিহার রাজ্যকে ভারতভুক্ত করেন এবং ১৯৫০ সালে পশ্চিমবঙ্গের জেলা হিসাবে অন্তর্ভুক্তি সম্ভব হয়। এইভাবে দীর্ঘস্থায়ী স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে। উল্লেখ্য রাজতন্ত্রের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে এ ধরণের লড়াই যখন চলছিল তখন এই রাজ্যে কংগ্রেসের কোন অস্তিত্বই ছিল না। গোপন অবস্থায় কম্যুনিস্ট নেতৃত্ব প্রজামণ্ডল এবং ছাত্রফেডারেশনের ছাত্রসহ বিভিন্ন গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির সহযোগে রাজতন্ত্রের অবসানের জন্য প্রবল আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল।

এই সময়কার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এ রকম ছিল : দেশ ভাগ হওয়ার ফলে পূর্ববাংলা থেকে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু সহায় সম্বলহীনভাবে আসতে থাকে। এর ফলে একটি বিশেষ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। কি কেন্দ্রের সরকার, কি রাজ্যের সরকার কেউই এদের ত্রাণ ও পূনর্বাসনের জন্য কোনরকম কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি। দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্থ উদ্বাস্তুদের প্রবেশের ফলে এখানকার জনসংখ্যা বেড়ে যায়। সম্পূর্ণ আশ্রয়হীনভাবে এরা কুচবিহার রেলওয়ে ষ্টেশনে এসে উপস্থিত হলেন। নির্মমভাবে এদের উপর পুলিশ ও মিলিটারীরা বিভিন্ন ধরণের অমানবিক ও পাশবিক অত্যাচার শুরু করে। উদ্বাস্তুদের উপযুক্ত জীবন প্রতিষ্ঠার দাবীতে '৪৯-'৫০ সালে এ জেলার ছাত্ররা গোটা রাজ্যের লড়াই-এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এক ঐতিহাসিক লড়াই সংগঠিত করে এবং লড়াই-এ কুচবিহারের ছাত্রফেডারেশন এক অভূতপূর্ব নজির স্থাপন করে।

'৫০ এর দশক ঃ ঐতিহাসিক আন্দোলন :

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের কোচবিহার জেলার অন্তর্ভুক্তির সূচনার কাল থেকেই কংগ্রেস তার তাণ্ডব শুরু করে দেয়। দেশভাগের পর ১৯৫১ সালে এ জেলায় প্রবল খাদ্য সঙ্কট দেখা দেয়। চালের দাম ৬০–৬৫ টাকা হয়ে যায়। একদিকে ওপার বাংলা থেকে ব্যাপকহারে উদ্বাস্তু আগমনের ফলে এবং তৎকালীন ভারত সরকারের রেশনিং ব্যবস্থার সুবন্দোবস্ত না থাকার ফলে শহর ও গ্রামাঞ্চলের মানুষদের অর্ধাহার ও অনাহার ছিল নিত্যসঙ্গী। ফলে এ জেলায় এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। প্রজামণ্ডল, ফরওয়ার্ডব্লক, সোসালিস্ট পার্টি মিলিতভাবে সস্তা দরে খাদ্যের দাবীতে জেলাশাসকের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করে। জেলা শাসক তাদের দাবী প্রত্যাখ্যান করেন। ১৯শে এপ্রিল খাদ্য পরিস্থিতি স্বাভাবিকীকরণের দাবীতে সাগরদীঘির পাড়ে অনশন হয়। ২০শে এপ্রিল কুচবিহার জুড়ে পালিত হয় সাধারণ ধর্মঘট ও হরতাল। ২১শে এপ্রিল খাদ্যের দাবীতে শুরু হয়

ভুখা মানুষের মিছিল। ভুখা মিছিলের প্রথমেই ছিল জেনকিন্স স্কুলের ছাত্ররা, মিশনারী স্কুল (নৃপেন্দ্র নারায়ণ স্কুল)-এর ছাত্ররা এবং সুনীতি একাডেমী'র ছাত্রীরা। মিছিল সংগঠিত করেছিলেন ছাত্র ফেডারেশনের নেতা সমর সাহা, মনমোহন সেন, দেবীদাস লাহিড়ী, গীতা লাহিড়ী, মানিক ব্যানার্জী, অশোক সেন প্রমুখ ছাত্র নেতা সহ তদানীন্তন ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যাপক চূণীলাল মুখোপাধ্যায়, দুর্গেশ নিয়োগী, নরেশ বোস, অপরাজিতা গোপ্পী, রমেশ রায়, সুরেশ তালুকদার, যাদব আচার্য্য, লতিকা নিয়োগী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। '৫১ সালে খাদ্যের দাবীতে শান্তিপূর্ণ ভুখা মিছিলের উপর কংগ্রেসী পুলিশের নৃশংস গুলি চালনায় কবিতা, বকুল, বন্দনা, সতীশ ও বাদল শহীদ হন এবং ঘটনাস্থলে অনেক ছাত্র-ছাত্রী সহ মোট ৪১ জন গুরুতরভাবে আহত হন। এই গুলি চালনার প্রতিবাদে গর্জে ওঠেন কুচবিহারের আপামর জনগণ। "খাদ্যের বদলে গুলি" এই বিরল ঘটনায় সারা দেশ আন্দোলিত হয়ে ওঠে। এর মধ্য দিয়ে এই জেলার জনগণের সংগ্রাম আর একটি নতুন মোড় নেয়। সমস্ত শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে কংগ্রেস কায়েমী স্বার্থের শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ছাত্রসম্প্রদায় ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির ভূমিকা যেমন দেশীয় রাজ্য কোচবিহারে ছিল তেমনি জেলায় রূপান্তরের পরেও তা আত্মপ্রকাশ করেছে জনগণের শক্তি হিসাবে।

কুচবিহার জেলা ছাত্রসংঘ ঃ

'খাদ্যের বদলে গুলি' এই ঘটনার পর থেকেই গোটা জেলার ছাত্রসমাজের মধ্যে কংগ্রেস বিরোধী আন্দোলন নতুনভাবে দানা বাঁধতে থাকে। গঠিত হয় '২১শে এপ্রিল সংগ্রাম পরিষদ'। এই সংগ্রাম পরিষদের ডাকে জননেতা জ্যোতি বসু কুচবিহারে সভা করেছিলেন। এই সভার শেষে শহরের প্রখ্যাত আইনজীবী শ্রদ্ধেয় নলিনীকান্ত দে সরকার মহাশয়ের কাছারী ঘরে জেলার ছাত্রদের সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে জ্যোতি বসুর উপস্থিতিতে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভা থেকে ছাত্রফেডারেশনকে কুচবিহার জেলা 'ছাত্র সংঘ' নামে ছাত্রদের সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে একটি সমিতি গড়ে ওঠে। সেই সমিতির সভাপতি হন – রাধিকা মোহন ভট্টাচার্য ও সম্পাদক হন সমর সাহা। নলিনী দে সরকারের বাড়িতে ছাত্রদের সংগঠিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন তৎকালীন ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্র – মনমোহন সেন, সমর সাহা, অশোক সেন, বাণী সেন, চিত্তরঞ্জন বক্সী, কবীন্দ্র মোহন সমাজদার, কল্যানী সেন, চঞ্চল ঘোষ, গীতা লাহিড়ী প্রমুখ। জেলায় যুক্ত আন্দোলনের এখান থেকেই সূত্রপাত।

স্বাধীনোত্তর কুচবিহারে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য আন্দোলন ঃ

সংগঠিত ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাসে রাজতন্ত্রের যুগেই কুচবিহার-এর ছাত্র আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে একটি বিশেষ স্থান দখল করেছিল। কুচবিহার ভারতভুক্তির পরেও এই ঐতিহ্য অব্যাহত রেখেছে। '৫০-এর দশকের শুরু থেকেই এই ধরণের অনেকগুলি আন্দোলন ও সংগ্রাম সংগঠিত হয়েছে :-

এক. ১৯৫২ সালে ছাত্রসংঘের সম্মেলন ও জিৎপুর দ্বিতীয় খণ্ড (নিগমনগর) উদ্বাস্তু সম্মেলন।

দুই. কুচবিহার জেলা লোক-সংস্কৃতি পরিষদ গঠন।

তিন.　১৯৫৩ সালে ভিক্টোরিয়া কলেজে পরীক্ষার ফি-বৃদ্ধির প্রতিবাদে আন্দোলন ও ছাত্রসংসদ নির্বাচন।

চার.　১৯৫৪ সালের প্রলয়ঙ্করী বন্যায় ত্রাণ সংগঠিত করা।

এক.　ছাত্রসংঘের সম্মেলন :

১৯৫২ সালে কুচবিহারে ছাত্রসংঘের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেই সম্মেলন-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছিলেন অগ্নিযুগের বীরবিপ্লবী, মাস্টারদার সহযোগী শ্রদ্ধেয় কমরেড গণেশ ঘোষ। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন ছাত্রফেডারেশনের নেত্রী গীতা মুখার্জী। সেই সম্মেলনে তৎকালীন কংগ্রেস সরকারের 'স্কুল কোড' (ছাত্রভর্তি নিয়ন্ত্রন, ছাত্র ও শিক্ষকদের উপর নানা ধরণের বিধিনিষেধ, শিক্ষকদের বেতন নিয়ন্ত্রন ইত্যাদি) বাতিলের উদ্দেশ্যে ছাত্রদের সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পাশাপাশি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য ও সস্তাদরে খাদ্যের বিলিবণ্টনের দাবীতে কুচবিহারের দিনহাটা মহকুমায় জিৎপুর ২য় খণ্ড (নিগমনগর)-এ উদ্বাস্তু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন প্রজামণ্ডলের নেতা রমেশ রায় এবং ছাত্রফেডারেশনের নেতা মনমোহন সেন।

দুই.　লোক সংস্কৃতি পরিষদের গঠন :

তৎকালীন ছাত্রসংঘের নেতৃত্বরা সমাজ সম্পর্কে অনুসন্ধান করা, প্রতিটি সামাজিক শ্রেণীর জীবনযাত্রা ও কার্যাবলী সম্পর্কেঅনুসন্ধান করে পরিস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনই একমাত্র পাথেয় হিসাবে গ্রহণ করতেন। পরিস্থিতি সম্পর্কে পরিকল্পনা মাফিক অগ্রসর হতে হবে, নগর ও গ্রামের প্রতি মনোযোগ সন্নিবদ্ধ করতে হবে এবং মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে শ্রেণী বিশ্লেষণের মাধ্যমে গ্রাম-নগরের জীবনযাত্রার সমীক্ষা তৈরী করে কোচবিহারের সামাজিক সমস্যাবলীর নির্যাস আরও অত্যন্ত যত্নশীলভাবে। "মাটির দিকে চোখ রাখা – মাথা উপরে তুলে আকাশের দিকে চেয়ে থাকা নয়" – মাও সে তুং-এর উদ্ধৃতিটি ধরে এখানকার গণতান্ত্রিক চেতনা বিকশিত করার জন্য সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবে প্রখ্যাত শিল্পী পানুপালের সহায়তায় সাধনা উপাধ্যায়, পুরবী চৌধুরী, অর্চনা ভাদুড়ী, বানী সেন, কল্যানী সেন প্রমুখের উদ্যোগে' লোক সংস্কৃতি পরিষদ' গঠিত হয়।

তিন.　ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্র সংসদ গঠন :

১৯৫৩ সাল জুড়ে ছাত্রদের পরীক্ষার ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে শিক্ষার সুযোগ ও প্রসার ঘটানোর দাবীতে এখানে ছাত্র আন্দোলন সংগঠিত হতে থাকে। একদিকে '৫১ সালের আন্দোলন-এর প্রভাব অপরদিকে '৫৩ সালে ট্রামভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে রাজ্যজুড়ে ছাত্রফেডারেশন সহ দশটি সংগঠন যৌথভাবে তুমুল আন্দোলন-এর ফলস্বরূপ এখানকার ছাত্ররা রাস্তায় নেমে আসে। পরীক্ষার ফি ২০–৪০ টাকা বৃদ্ধির প্রতিবাদে ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্রসংসদ নির্বাচনে ছাত্রফেডারেশন বিপুলভাবে জয়ী হয়। এই নির্বাচনই ভিক্টোরিয়া কলেজের প্রথম সাধারণ নির্বাচন। ঐ সময় ছাত্রসংসদের সম্পাদক ও সহসভাপতি হয়েছিলেন নীরোজ বিশ্বাস ও দীনেশ ডাকুয়া। ঐ সময় পত্রিকা সম্পাদক নির্বাচিত হন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় (বর্তমানে প্রখ্যাত সাহিত্যিক)। ছাত্র সংসদ নির্বাচনের পর ফি-বৃদ্ধির প্রতিবাদে ছাত্রফেডারেশন ও ছাত্র সংসদ কর্তৃক অনির্দিষ্ট কালের জন্য ছাত্র ধর্মঘট

সংঘটিত হয়। ছাত্র ধর্মঘট সংগঠিত করার অপরাধে ঐ সময় ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্রনেতা দীনেশ ডাকুয়া ও নীরোজ বিশ্বাস কলেজ থেকে বহিস্কৃত হন।

চার. '৫৪ সালের প্রলয়ঙ্করী বন্যা :

১৯৫৪ সালের প্রলয়ঙ্করী বন্যায় ভেসে যায় কুচবিহার। ভেসে যায় জেলার ব্যাপক বিস্তীর্ন এলাকা, ঘরবাড়ি, রাস্তা-ঘাট এবং বালি চাপা পড়ে হাজার হাজার একর জমির ফসল। '৫৪ সালের প্রাকৃতিক বিপর্যয় এই জেলার অর্থনীতিকে বিধ্বস্ত করে। পণ্ডিত নেহেরু এ সময় কুচবিহারে এসেছিলেন। আকাশ থেকে বিমানে বন্যার ধ্বংসলীলা দেখে রাজপ্রাসাদে সভা করে ভোজ শেষে বলেছিলেন – বন্যা আশীর্বাদ।" বন্যা বিধ্বস্ত কোচবিহারের পুনর্গঠন খাদ্য রিলিফের জন্য গ্রামে গ্রামে জনগণকে সংগঠিত করে আন্দোলন গড়ে তোলা ছাত্রফেডারেশনের কর্মীদের প্রধান কাজ হিসাবে করতে হয়। এই সময় ছাত্রফেডারেশনের কর্মীরা বানেশ্বর, আমবাড়ি, কালজানি, খোলটা প্রভৃতি স্থানে ত্রাণ পৌছান। পাশাপাশি তৎকালীন কংগ্রেস শাসকের কাছে বন্যার্ত মানুষের সাহায্যার্থে বিভিন্ন দাবী দাওয়া নিয়ে আন্দোলন সংগঠিত হতে থাকে। এসবের মধ্য দিয়েই কুচবিহারের জনগণের মনে ছাত্রফেডারেশন সম্পর্কে তাদের আশা বেড়ে ওঠে এবং কংগ্রেসের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে।

'৫০-এর দশকের কয়েকটি বিশেষ কর্মসূচী :

'সংস্কৃতি সংস্কৃতির জন্য নয়, সংস্কৃতি হল জনগণের জন্য।' ছাত্রসংঘের কর্মীরা 'লোক-সংস্কৃতি-পরিষদ' গঠন করে শহরের বিশিষ্ট ঘরের ছেলে-মেয়েদের সংগঠিত করার জন্য রবীন্দ্রনাথের 'রথেররশি' নৃত্য-গীতি আলেখ্যটি উপস্থাপিত করেছিলেন মুক্ত মঞ্চ গঠন করে। মুক্ত মঞ্চটি গঠিত হয়েছিল বর্তমান কোচবিহার ক্লাবের সংলগ্ন ফাঁকা ময়দানটিতে। ঐ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন – পানু পাল, নিরঞ্জন সেন, মমতাজ আহমেদ, বীরেশ মুখার্জী ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ।

স্বাস্থ্যদিবস : কোচবিহারের হাসপাতালগুলিতে দুঃস্থ রোগীদের সহায়তার জন্য তৎকালীন ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে সংস্কৃতির কর্মীদের নিয়ে রাস্তায় স্কোয়াড সংগঠিত করে গণসংগ্রহ করা এবং হাসপাতালের রোগীদের পথ্য, সুচিকিৎসা এবং সুবন্দোবস্ত ইত্যদির জন্য স্বাস্থ্যদিবস পালনের কর্মসূচী গৃহীত হয়েছিল। যদিও এই কর্মসূচী গ্রহণ করতে সহযোগিতা করেছিলেন তৎকালীন কম্যুনিস্ট নেতা দেবী নিয়োগী। কারণ দেবী নিয়োগী যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়ে জে. ডি. হাসপাতালে তখন ভর্তি ছিলেন। সেই সময় রোগীদের সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত সরকার থেকে সেরকমভাবে করা হ'ত না। ফলতঃ অধিকাংশ রুগী বিনা চিকিৎসায়, অর্ধাহারে এবং অপুষ্টি জনিত কারণে মা ও শিশু মৃত্যু ছিল নিত্তনৈমিত্তিক ঘটনা।

গ্রামে গরীব কৃষকদের সামাজিক ঐক্য গড়ে তোলার কাজে এবং শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে আন্দোলনে বঞ্চিত, শোষিত মানুষদের বেশী সংখ্যায় জমায়েত সংগঠিত করার জন্য প্রকৃত বৈপ্লবিক সংগ্রামে গ্রামীন মানুষের ভূমিকা নির্ধারণ তৎকালীন ছাত্র নেতৃত্ব ছাত্র আন্দোলনের সঠিক কৌশল রপ্ত করতে পেরেছিলেন।

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম :

স্বাধীনতার পরবর্তী যুগের কুচবিহারের ছাত্র আন্দোলন কেবলমাত্র জেলার ভিতরের কিছু সমস্যা নিয়েই ব্যস্ত ছিল না। এই সময়কালে বিশেষ করে পঞ্চাশের দশকে কোচবিহারের ছাত্ররা

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী নানা কর্মসূচীতে সামিল হয়েছেন। কোরিয়ার বুকে সাম্রাজ্যবাদীদের আক্রমণের বিরুদ্ধে, ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে, পাক্-মার্কিন সামরিক চুক্তির প্রতিবাদে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পারমানবিক অস্ত্রসজ্জার বিরুদ্ধে শান্তির আন্দোলন, সমাজতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব এবং বিভিন্ন দেশের মুক্তিসংগ্রামের সমর্থনে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছিল। '৫৪ সালের ২৪শে এপ্রিল পাক্-মার্কিন সামরিক চুক্তির বিরুদ্ধে এবং হাইড্রোজেন বোমা নিষিদ্ধ করার দাবীতে বিভিন্ন কর্মসূচী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের এক উজ্জ্বল নিদর্শন।

ছাত্র-শিক্ষক ঐক্যের নতুন নজীর :

১৯৫৪ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির ডাকে শিক্ষকদের বেতন ও ভাতা বৃদ্ধির দাবীতে ১২ দিন ধরে লাগাতার কর্মবিরতি আন্দোলন হয়। আন্দোলনের প্রথমদিন থেকেই এই জেলার ছাত্ররা ধর্মঘট করে শিক্ষকদের পাশে এসে দাঁড়ায়। প্রতিদিনই বিভিন্ন স্কুল এবং এ. বি. এন. শীল কলেজের (তৎকালীন ভিক্টোরিয়া) ছাত্ররা শিক্ষক ধর্মঘটের পাশাপাশি ধর্মঘট চালিয়ে গেছে। সেদিনের ধর্মঘটী শিক্ষকদের সমর্থনে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ সমবেত হয়েছিল।

১৯৫৬ সাল – জেলার ছাত্র আন্দোলনের প্রসারণ :

১৯৫৬ সালে পশ্চিমবঙ্গে ডঃ বিধান চন্দ্র রায়-এর নেতৃত্বে কংগ্রেসী সরকার ক্ষমতায় ছিল। প্রস্তাব আসে পশ্চিমবাংলা ও বিহার সংযুক্তিকরণের। বাস্তবিক পক্ষে বিপন্ন হয়ে উঠল পশ্চিমবাংলার মানুষের জাতিসত্বা। সারা বাংলার উত্তাল প্রতিবাদের এই ঢেউ আন্দোলিত করেছিল কোচবিহারের ছাত্র আন্দোলনকেও। কুচবিহারের ছাত্ররা ছাত্রফেডারেশনের নেতৃত্বে সংযুক্তি প্রস্তাবের বিরোধীতা করেন। এ সময় এই সংযুক্তির প্রতিবাদে এবং ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের দাবীতে সারা ভারত জোড়া আন্দোলনে কুচবিহারের ছাত্রফেডারেশনের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। প্রাদেশিক সম্প্রীতি রক্ষায়, ছাত্রফেডারেশনের উদ্যোগে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা আন্দোলনের সমর্থনে কোচবিহারের ছাত্ররা অগ্রনী ভূমিকা নিয়েছিল। এই সময় যাঁরা ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁরা হলেন – চিত্ত বক্সী, বাবু নন্দী, প্রবোধ রায়, আশীষ সর্বাধ্যক্ষ্য। এঁরা ইতিমধ্যে গোয়ার পর্তুগীজ শাসক অবসানের দাবীতে কোচবিহার থেকে গোয়ার মুক্তি যুদ্ধের স্বেচ্ছা সেনানী হিসাবে শর্মাধিকারীকে পাঠানো হয়।

এরকম এক উত্তাল রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্য দিয়ে '৫৬ সালে দিনহাটা কলেজের তোজাম্মেল হোসেনের নেতৃত্বে ছাত্ররা সংগঠিত হতে শুরু করে। কিন্তু সেই সময় দিনহাটা কলেজে প্রকাশ্যে ছাত্রফেডারেশনের কাজ করার মতো রাজনৈতিক অবস্থান ছিল না।

১৯৫৭ সাল – গোটা দেশে দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচন। এই সময়টা দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে ঘটনাবহুল সময়। একদিকে কংগ্রেসী সরকারের আগ্রাসী জনবিরোধী ভূমিকা এবং বিপরীতে হিংস্রতাকে উপেক্ষা করে, ভয়কে জয় করে জনতার সংগ্রামের ইতিহাসের প্রেরণায় আমাদের এগিয়ে চলা। '৫৭ সালের নির্বাচনে কেরলে নাম্বুদ্রিপাদের নেতৃত্বে গঠিত হয় দেশের প্রথম অকংগ্রেসী সরকার। কংগ্রেস বিরোধী এই মনোভাব জেলার ছাত্রদের মধ্যেও দানা বাঁধতে শুরু করে।

'৫৭ সালের শেষের দিকে কোচবিহারের ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে দিনহাটা মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রফেডারেশন-এর কর্মীরা প্রকাশ্যে কাজকর্ম শুরু করেন। ঐ সময় দিনহাটায় ছাত্র আন্দোলনে

নেতৃত্ব দান করেছেন সরোজ বর্মা, সইদার রহমান। সইদার রহমান '৫৮ সালে দিনহাটা মহাবিদ্যালয় ছাত্রসংসদ নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন।

'৫৯ সাল – কংগ্রেস শাসনের কলঙ্কজনক অধ্যায় :

গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী (!) কংগ্রেসী কেন্দ্রীয় সরকার দু'বছরও সহ্য করতে পারলেন না কেরলের এই অকংগ্রেসী রাজ্য সরকারকে। আরব সাগরের তীরে বিভৎস গণতন্ত্র হত্যার প্রতিক্রিয়া শুধুমাত্র নিম্ন হিমালয়ের তরাই অঞ্চলে থেমে থাকে নি। সমগ্র পশ্চিমবাংলার পথে সেদিন কম্যুনিস্ট বামপন্থীদের সমর্থনে ছাত্রফেডারেশনের দৃপ্ত পদচারণ ও প্রতিবাদী কণ্ঠ ধ্বনিত হয়েছিল। '৫৯ সালের ১লা আগস্ট কেরালার কম্যুনিস্ট সরকারকে ভেঙে দেওয়ার প্রতিবাদে সাধারণ ধর্মঘটের পাশাপাশি ছাত্রধর্মঘটও সংঘটিত হয়েছিল। স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল ভিক্টোরিয়া কলেজ।

কংগ্রেস সরকার-এর জনবিরোধী ও জমিদার ঘেঁষা কৃষিনীতির ফলে বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলের দারিদ্র, অনাহার ও খাদ্যসঙ্কট ছিল মানুষের নিত্যসঙ্গী। '৬৯ সালের খাদ্যের পরিস্থিতি গোটা পশ্চিমবাংলায় ভয়াবহ আকার নেয়। ঐসময় কুচবিহার জেলায় বামপন্থী দলগুলির নেতৃবৃন্দ দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি গঠন করে কংগ্রেসী খাদ্যমন্ত্রীর অপসারণ এবং সস্তাদরে খাদ্যের দাবীতে আগস্ট মাস জুড়ে গোটা রাজ্যের সঙ্গে এ জেলাতেও তুমুল গণআন্দোলন গড়ে তোলেন। এই গণআন্দোলনের কর্মসূচী হিসাবে ৩১শে আগস্ট এক বিরাট গণমিছিল রাইটার্স বিল্ডিং অভিযান করে। এই মিছিলে অংশগ্রহণকারী অধিকাংশই ছিলেন গ্রামাঞ্চলের অভুক্ত কৃষক। খাদ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ ও সস্তায় খাদ্যের দাবীতে শ্লোগান দিতে দিতে মিছিল যখন রাইটার্সে যাচ্ছিল কংগ্রেস সরকারের পুলিশ তখন বেপরোয়া লাঠি চালায় এবং কাঁদানে গ্যাস প্রয়োগ করে। এর প্রতিবাদে পরদিন ১লা সেপ্টেম্বর রাজ্যজুড়ে ছাত্ররা ধর্মঘট ও প্রতিবাদ মিছিল সংগঠিত করে। ঐ দিন কুচবিহার শহরেও ছাত্র ধর্মঘট সংঘটিত হয়। ১লা সেপ্টেম্বর ছাত্ররা বিশাল মিছিল নিয়ে কলকাতার রাজপথে কৃষকদের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। এই মিছিলের উপর পুলিশ বর্বর আক্রমণ চালায়। ২র সেপ্টেম্বর এর প্রতিবাদে, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির ডাকে হরতাল ও সাধারণ ধর্মঘট পালন করা হয়। খাদ্যের দাবীতে এই রক্তাক্ষয়ী সংগ্রামে ৪ জন ছাত্রসহ কমপক্ষে ৮০ জন ব্যক্তি মারা যান। এর পর থেকে এই কলঙ্কজনক ঘটনায় নিহত শহীদদের স্মরণে প্রতিবছর ৩১শে আগস্ট দিনটিতে সাধারণ শহীদ দিবস হিসাবে পালন করা হয় এবং ১লা সেপ্টেম্বর দিনটিকে ছাত্র শহীদ দিবস হিসাবে পালন করা হয়। তাছাড়াও এ জেলায় ছাত্রসহ সমগ্রস্তরের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের নব নব অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হতে থাকে। '৫৯ সালে জমিদারদের ভেস্টেড্ জমি দখল আন্দোলনে ছাত্ররা ব্যাপকভাবে সহযোগিতা করেছিল। বস্তুতঃপক্ষে তখনই কোচবিহারে সংগঠিত কৃষক আন্দোলনে ব্যাপকতা আসে। '৫৯ সালে ভিক্টোরিয়া কলেজ ও দিনহাটা কলেজ ছাত্রসংসদ নির্বাচনে ছাত্রফেডারেশন জয়লাভ করে।

ছাত্র আন্দোলনের মধ্যে গুরুতর মতপার্থক্য :

'৫৬ সালে কংগ্রেস সরকারের কয়েকটি পদক্ষেপ বামপন্থী আন্দোলনে বিভ্রান্তি সৃষ্টিতে সফল হল। ঐ বছর নেহেরু দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পেশ করলেন যা'কে 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ গড়ে তোলা' পরিকল্পনার লক্ষ্য বলে বর্ণনা করা হ'ল। এই সময়ের কিছু আগেই ভারত-চীন মৈত্রীর প্রচেষ্টা, ভারত সোভিয়েত সহযোগিতা, রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে কয়েকটি ভারী শিল্প গড়ে তোলা, ITI ও পলিটেক্নিক শিক্ষার প্রসার ঘটানো এই ধরণের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছিল।

ভারতবর্ষের শিল্পপতি, ব্যবসায়ী শ্রেণীর স্বার্থে এবং তাদের সম্পদের বৃদ্ধির চাহিদা পূরণের তাগিদেই এই ধরণের কর্মসূচী কংগ্রেস গ্রহণ করে। পরবর্তী সময়ের ইতিহাসে একথা প্রমাণিত হয় যে, এটা সমাজতন্ত্র নয় জনগণের টাকায় মুষ্টিমেয় ধনীক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার প্রয়াস মাত্র। সমাজতান্ত্রিক এবং সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের মধ্যে দর কষাকষির মনোভাবই ধনীক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষাকারী কংগ্রেস সরকারের বৈদেশিক নীতির মূল বৈশিষ্ট্য। বিষয়টি আজকের দিনে বোঝা অত্যন্ত সহজ হলেও সেদিনের বড় বড় বুলির মাধ্যমে নেহেরু জনগণকে বেশ কিছুটা বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই সময় থেকেই ছাত্রফেডারেশনের নেতৃত্বের অধিকাংশের মধ্যেই সংগ্রাম বিমুখ ও আপোস মুখী মনোভাব প্রকাশ পেতে শুরু করল। প্রতিক্রিয়া হিসাবে ছাত্রফেডারেশনের মধ্যে সংগ্রাম মুখী ও সংগ্রাম বিমুখ এই দুই ধারার মধ্যে দ্বন্দ্ব তীব্র হ'ল। তখন সংশোধনবাদী চিন্তার অনুপ্রবেশকে রুখতে সমর্থ হয়েছিল কুচবিহারের ছাত্রফেডারেশন, যার ফলে পরবর্তী দশকগুলিতে ঘটনাবহুল অধ্যায়ের শরিক হ'তে পেরেছিল।

'৬০-এর দশকের ছাত্র আন্দোলন – কুচবিহারের রাজনীতিতে পটপরিবর্তন :

পাঁচের দশকের শেষের দিকে ঝোড়ো দিনগুলিকে অতিক্রম করে জেলার ছাত্র আন্দোলন ছয়ের দশকে নতুন অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়। অন্যভাবে দেখলে, ষাটের দশক ছিল ছাত্র আন্দোলনকে একটি সঠিক আদর্শের ভিত্তিতে সংহত করার জন্য ধারাবাহিক সংগ্রামের যুগ। এই দশকের সমস্ত সময় ধরেই ছাত্র আন্দোলনের সামনে কতকগুলি মৌলিক প্রশ্ন এসে দেখা দেয়। পাশাপাশি জেলার ছাত্র-আন্দোলন কয়েকটি বৃহৎ সংগ্রামে সাফল্যের জন্য এই দশককে কুচবিহারের রাজনৈতিক মানচিত্রে একটি স্থায়ী পটপরিবর্তনের যুগ হিসাবেও চিহ্নিত করা যায়। শত্রুর বিভিন্ন আক্রমণ মোকাবিলা করে মতাদর্শগত একটি সঠিক অবস্থান গ্রহণ করা এবং জেলার ছাত্র আন্দোলনকে নতুন পর্যায়ে উন্নীত করার কাজে সেই সময়ের ছাত্র নেতৃত্বকে সবসময় ব্যস্ত থাকতে হয়েছে।

'৫৯–'৬০ সাল বর্বর জমিদারদের ভেস্টেড জমি দখল, জেলার অন্যতম অত্যাচারী জোতদার খগেন বসুনীয়ার কয়েক হাজার বিঘা জমির ভাগচাষীর ফসলের ন্যায্য ভাগের দাবীতে আন্দোলন তীব্রতর হতে থাকে। এই ভাবেই ঐ আন্দোলন বসুনীয়ার বাড়তি জমি দখল রেখে চাষ করার সংগ্রামে অগ্রসর হয়। অপরদিকে, বৃহৎ জোতদার সিউপাল সিং-এর বাড়তি জমি দখলের সংগ্রামে কৃষকদের পাশে ঐ সময়কার ছাত্র আন্দোলনের কর্মীরাও অংশগ্রহণ করেছিলেন। কৃষক আন্দোলনের পাশে থেকে ঐ সময় ছাত্রফেডারেশন আওয়াজ তুলেছিল – "শুধু রিলিফের দাবী নয়, সভা-সমাবেশ, মিছিল, বিক্ষোভ প্রদর্শন আর নয়, কৃষকসমাজ শ্রেণী শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রত্যয় নিয়ে রুখে দাঁড়াও।" ঐ সময় আসাম থেকে বাঙ্গালী উদ্বাস্তুরা কোচবিহারে আসতে থাকলে ছাত্র ফেডারেশন-এর কর্মীরা আঞ্জুমান স্কুলে লঙ্গরখানা খুলে ও চিকিৎসা ক্যাম্প খুলে সহযোগিতা করেছিল।

'৬১ সাল – কোচবিহার রাসমেলায় অমর সার্কাস প্রদর্শনীর সময় সার্কাস পার্টির সঙ্গে কতিপয় দুষ্কৃতকারীর সংঘর্ষ হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে নৃপেন্দ্র নারায়ণ স্কুলের এক ছাত্রকে গাড়ি চাপা দিয়ে মেরে ফেলে। পুলিশের হাতে ছাত্রের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ছাত্রফেডারেশন ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দেয়। কংগ্রেসী পুলিশ সেদিন নির্মমভাবে ছাত্রসহ নিরীহ জনগণের উপর আক্রমণ চালায়। পুলিশি বর্বরতার বিরুদ্ধে পরবর্তীকালে ছাত্ররা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এই সময় ছাত্র আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন –

বিশ্বনাথ রায়, পরিমল সাহা, মনোজ রায়, শ্যামল বরণ রায়, গৌরবরণ রায় প্রমুখ। পুলিশি বর্বরতার বিরুদ্ধে জনগণ '৬২ সালের নির্বাচনে তাদের সমর্থন জ্ঞাপন করেন বামপন্থীদের প্রতি। এই জেলায় বামপন্থী শক্তি বিকাশের পথে ব্যাপকতা আসে।

'৬২ সালে চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধ :

ষাটের দশকের গোড়ার যুগ থেকে আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দোলনে বিভিন্ন ধরণের মতপার্থক্য দেখা দেয়। কম্যুনিস্ট আন্দোলনের রণকৌশল, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের ভবিষ্যৎ গতিপথ, সদ্য স্বাধীন দেশগুলোতে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামের পথ ও পদ্ধতি কি হবে – এ বিষয়ে তখন বিতর্ক চলছে। সে সময় ভারত-চীন সীমান্ত বিরোধ দেখা দিল। ছাত্রফেডারেশনের সে সময়ের সংগঠকদের ভাষায় – "আমাদের উপর মূল আক্রমণ এই কারণেই যে, আমরা চীন-ভারত সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান চেয়েছিলাম, চীন আক্রমণ করেছে এই বক্তব্যের সাথে আমরা একমত নই।" সীমান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে তখন ছাত্রফেডারেশনে মতাদর্শগত বিরোধ সৃষ্টি হয়। অবিভক্ত ছাত্রফেডারেশনের সম্পাদক নন্দগোপাল ভট্টাচার্য এ সময় কুচবিহারে আসতেন এবং ঘৃণ্য ভাষায় সভাপতি দীনেশ মজুমদার সহ অধিকাংশ ছাত্র নেতৃত্বকে 'উগ্রপন্থী' আখ্যা দিয়েছিলেন। সেই সময় নেতাদের উদ্দেশ্যে প্রমথ নাথ বিশী ছড়া বের করেছিলেন –

'হরেকৃষ্ণ কোঁয়ার
লাল ঘোড়ে কা সওয়ার
বঙ্গদেশ রঙ্গ কেন
খোলা চীনের খোঁয়াড়।'

আবার, 'রণদিভে, রণদিভে
আর কত হে রং দিবে।'

(সংগ্রহ – 'কিভাবে ছাত্র আন্দোলন পুনরুজ্জীবিত হল' – শ্যামল চক্রবর্তী ; ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার – ১০৭ পৃষ্ঠা)

সীমান্ত সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে সর্বত্রই চীন আক্রমণকারী এই উগ্র জাতীয়তাবাদী প্রচারের হাওয়া তোলা হ'ল। ছাত্রফেডারেশনের তৎকালীন নেতৃত্ব এই অপপ্রচারের কাছে আত্মসমর্পন করলেন এবং দেশ রক্ষার নামে উগ্র চান বিরোধী প্রচারে সব ধরণের উগ্র কম্যুনিস্ট বিরোধী শক্তিগুলোর সঙ্গে গলা মেলালেন। কোচবিহারের ছাত্র আন্দোলনের একটা উজ্জ্বল অতীত এই যে এখানকার ছাত্রনেতৃত্বরা ঐ প্রচারে গা ভাসান নি, তাঁরা চান-ভারত সীমান্ত বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার দাবীতে প্রচার চালিয়ে গেছেন। এখানকার ছাত্ররা সেই সময় শান্তির স্বপক্ষে শ্লোগান তুলেছিলেন – 'যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই' আর শিল্পীদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল – 'বিশ্বে জেগেছে নওজোয়ান।' তখন তৎকালীন ছাত্রফেডারেশনের নেতৃত্বকে হয়রানি করবার জন্য ভিক্টোরিয়া কলেজের দেওয়ালে লেখা হয়েছিল – 'এসো লাল রঙ্গে রাঙা দেশে সীমানা হারায়ে' – এইভাবে ছাত্রফেডারেশনের মধ্যে যারা দক্ষিণপন্থী তারা তখন বামপন্থীদের কটূক্তি করত। এই সময় আমেরিকার বৈমানিক ছত্রছায়ায় ভারতকে থাকতে হবে এবং ভয়েজ অব্ আমেরিকার একটি কেন্দ্র

স্থাপিত হবে ভারতে – আমেরিকার সঙ্গে এক চুক্তিতে ভারত যখন আবদ্ধ হল, তখন এ জেলার ছাত্ররা তাদের উপলব্ধির মধ্য দিয়ে এটাকে রাজনৈতিক ইস্যু তৈরী করে বিক্ষোভ আন্দোলনের কর্মসূচী নিয়েছিল।

জেলার ছাত্রফেডারেশনের তৎকালীন নেতৃত্ব এই সময় কলেজ স্তরে আন্দোলন সংগঠিত করার জন্য কলেজের সমস্যা নিয়ে আন্দোলনে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল উগ্রজাতীয়তাবাদী ঝোঁক থেকে ছাত্রদের রক্ষা করা এবং অরাজনৈতিক সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ছাত্রফেডারেশনের কর্মীদের (বামপন্থী) প্রবেশের পথ অনেকটা সুগম করা।

'৬৩ সালের জুন-জুলাই মাসে ভর্তির সমস্যা নিয়ে এ জেলায় আন্দোলন, আসন সংখ্যা বৃদ্ধি, নিয়মিত ক্লাস-পরীক্ষা গ্রহণ করতে হবে – ছাত্রফেডারেশনের এই দাবীগুলির বিরোধিতা করল ছাত্র পরিষদ ও কংগ্রেস। এই সময় পুলিশ ও গুণ্ডাবাহিনী তৎকালীন ছাত্রনেতৃত্বের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। অমানবিক প্রহার, সিগারেটের ছ্যাঁকা দেওয়া – বিভিন্ন ধরণের বর্বর অত্যাচারের ফলে ছাত্র আন্দোলনের সংগঠিত কর্মীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলেন।

এই পরিস্থিতিতে ছাত্রফেডারেশনকে আর সংগঠিত রাখা গেল না। বেশ কিছুদিন ধরেই কংগ্রেসের মূল্যায়ণ, সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম এবং ভবিষ্যতে আন্দোলনের পথ কি হবে তা নিয়ে সংগঠনের ভিতর বিতর্ক চলছিল। কিন্তু চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন ছাত্রফেডারেশনের নেতৃত্বের একাংশের ভূমিকা সংগঠিত ছাত্রআন্দোলনের এযাবৎকাল অনুসৃত মূল নীতিগুলিকে বিপদাপন্ন করে তলিল। সংগঠিত ছাত্র আন্দোলনের একেবারে গোড়ার যুগ থেকেই উগ্র জাতীয়তাবাদী ভাবাবেগের বিরুদ্ধে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধের আদর্শই ছিল আন্দোলনের মূল বৈশিষ্ট। কিন্তু ছাত্রফেডারেশনের নেতৃত্বের একাংশ সেই আদর্শকে জলাঞ্জলী দেন। স্বাভাবিকভাবেই ছাত্রফেডারেশনের মধ্য দিয়ে ছাত্র আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য ও তার সংগ্রামী ঐতিহ্যকে বিকশিত করার লক্ষ্যে বিকল্প পথ গ্রহণ করা হয় এবং '৬৪ সালের ১৭–১৯শে আগস্ট কোলকাতার মুসলিম ইনষ্টিটিউট হলের রাজ্য সম্মেলন থেকে পুনর্গঠিত BPSF-এর যাত্রা শুরু হয়। ছাত্রফেডারেশনের সপ্তদশ সম্মেলনে কুচবিহার থেকে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন – বিমল দত্তগুপ্ত, বিকাশ সরকার, জ্যোতিষ ভৌমিক, মনোজ রায় প্রমুখ। রাজ্যস্তরে দীনেশ মজুমদার ও সুবিনয় ঘোষের নেতৃত্বে সমাজতন্ত্রের মূল আদর্শকে সামনে রেখে সংশোধনবাদী ঝোঁকের কবল থেকে ছাত্রফেডারেশনকে রক্ষার্থে বৃহত্তর ছাত্র আন্দোলনের পটভূমি রচনার স্বার্থে জেলা ছাত্রফেডারেশনের চতুর্থ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কোচবিহার নাট্যসংঘে। সেখান থেকে সভাপতি নির্বাচিত হন – মনোজ রায় এবং সম্পাদক জ্যোতিষ ভৌমিক নির্বাচিত হন।

চতুর্থ সম্মেলনের পর থেকে এ জেলায় ছাত্রফেডারেশনের নেতৃত্বে রাজবন্দীদের মুক্তির দাবী, জেলাব্যাপী খাদ্যসঙ্কটের সময় সস্তা দরে খাদ্য, কেরোসিন তেল ও DIR প্রত্যাহারের দাবীতে আন্দোলন সংগঠিত হতে থাকে। তৎকালীন সময়ে আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদান করেছেন – পরিমল দেব, বিকাশ সরকার, শেখর সরকার, বিপুল গুহ, বকাই বিশ্বাস, বিশ্বেন্দু চক্রবর্তী, রঞ্জিৎ চক্রবর্তী, তৃপ্তি চক্রবর্ত্তী, দীপিকা পাঠক, কল্পনা রায় প্রমুখ।

'৬৫ সালে ভারত-পাক যুদ্ধের জন্য সংগঠনের নেতৃত্বকে কখনো 'চীনের দালাল' কখনো 'পাকিস্তানের দালাল' আখ্যা দিয়ে কুৎসা এবং ঘৃণার অভিযান শত্রুপক্ষ সংগঠিত করছিল।

সংশোধনবাদী নেতৃত্বের তরফ থেকে এই সমস্ত অন্যায় কুৎসার প্রতিবাদ করা হ'ত না। এই সময় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী প্রচার, ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে কর্মসূচী গ্রহণ, ছাত্রজীবনের বিভিন্ন সমস্যা ও গণতান্ত্রিক দাবীর ভিত্তিতে ছাত্র আন্দোলনকে সংগঠিত করার চেষ্টা এ জেলায় চলতে থাকে।

'৬৫ সালের এই যুদ্ধকে কেন্দ্র করে জেলা ছাত্রফেডারেশনের সভাপতি কমরেড জ্যোতিষ ভৌমিককে DIR-এ গ্রেফতার করা হয়। ছাত্র আন্দোলন ও গণআন্দোলনের বিকাশমান শক্তিগুলির উপর শুরু হয় ব্যাপক পুলিশি ও শাসকশ্রেণীর গুণ্ডাবাহিনীর আক্রমণ। এই সালের ১লা সেপ্টেম্বরের একটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য – ভিক্টোরিয়া কলেজের গেটে ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে ছাত্র শহীদ দিবস পালিত হচ্ছে এমন সময় নেমে আসে কংগ্রেসী গুণ্ডাবাহিনীর নগ্ন আক্রমণ। কলেজ গেটে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের সরাসরি সংঘর্ষ হয় গুণ্ডাবাহিনীর। মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ স্কুলের ছাত্ররাও কংগ্রেসী গুণ্ডাবাহিনীর আক্রমণ প্রতিরোধ করতে এগিয়ে আসে। '৬৫ সালের শেষের দিকে কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন সরকারের পক্ষ থেকে নতুন খাদ্যনীতি ঘোষণা করেন। ঘোষণাটি ছিল – "ভাতের বদলে কাঁচকলা খাও।" সেদিক থেকে '৬৫ সাল ছিল আসন্ন ঝড়ের ইঙ্গিতবাহী।

'৬৬ সালের খাদ্য আন্দোলন :

'৬৬ সালের খাদ্য-আন্দোলন এই জেলার গণতান্ত্রিক ও ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাসে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে থাকবে। এই আন্দোলনই জেলার রাজনৈতিক মানচিত্রে একটি স্থায়ী পরিবর্তন এনে দিতে সাহায্য করেছে. '৬৫ সালের শেষদিকে মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেনের ঘোষণা – যে খাদ্যনীতিতে খাদ্য সঙ্কটের তো কোন প্রতিকার হলই না বরং গ্রাম-শহরে ব্যাপক দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হয়। এই সর্বনাশা খাদ্যনীতির সুবাদে (?) এ রাজ্য থেকে হাজার হাজার টন খাদ্য বাইরের রাজ্যে পাচার হওয়ার সংবাদ প্রতিদিন সংবাদপত্রের পাতায় প্রকাশিত হ'তে শুরু করল। সরকারের পক্ষ থেকে মজুতদারী বন্ধের কোন ব্যবস্থা না নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সেন মানুষকে ভাতের বদলে কাঁচকলা খাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। জনগণের প্রতি কংগ্রেসের এই সীমাহীন অবজ্ঞায় জনগণ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। সরকার অনুসৃত নীতির ফলে গোটা রাজ্যে কেরোসিন তেল সহ অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অস্বাভাবিক সঙ্কট দেখা দেয়, তার উপর ১৭ই জানুয়ারী এক বিবৃতি জারি করে রেশনে চালের দাম বাড়ানো হল। গোটা রাজ্য জুড়ে মানুষ সস্তা দরে চাল ও কেরোসিন তেল সরবরাহ এবং বন্দী মুক্তির দাবীতে আন্দোলন, সংগ্রাম সংগঠিত করতে থকে। শুরু হয় BPSF সহ অন্যান্য বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হওয়ার মহড়া।

সস্তা দরে চাল ও কেরোসিন-এর দাবীতে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। ১৬ই ফেব্রুয়ারী উত্তর ২৪-পরগণার বসিরহাটে ছাত্ররা ব্যাপক বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। বিক্ষোভকারীদের উপর পুলিশ লাঠি চার্জ করে ও পরে গুলি চালায়। ছাত্র পুলিশের খণ্ডযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আন্দোলন নতুন দিকে মোড় নেয়। পরদিন ১৭ই ফেব্রুয়ারী গোটা রাজ্যের সঙ্গে কুচবিহারেও এর প্রতিবাদে ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। এই দিন পুলিশের গুলিতে নিহত হল – ১২ বছরের কিশোর নুরুল ইসলাম। ১৮ই ফেব্রুয়ারী গোটা কুচবিহারের স্কুল-কলেজগুলি স্তব্ধ হয়ে যায়। ছাত্ররা প্রতিবাদে মুখর হয়ে রাস্তায় নেমে আসেন। স্বরূপনগরে এই গুলি চালনার প্রতিবাদে ২২শে ফেব্রুয়ারী ছাত্র সংগ্রাম কমিটির ডাকে সারা বাংলা ছাত্র ধর্মঘট আহ্বান করা হয়। কুচবিহার

জেলাতেও খাদ্য আন্দোলন দুর্নিবার গতিতে চলতে থাকে যার মধ্য দিয়ে এ জেলার সংগঠিত গণআন্দোলনে জোয়ার আসে। এই আন্দোলনকে দমন করার জন্য পুলিশ ও কংগ্রেসী গুণ্ডাবাহিনী বিভিন্নভাবে ছাত্রফেডারেশনের উপর আঘাত হানে।

ক্রমাগত আঘাতের পরেও জেলার ছাত্র আন্দোলন দমানো যায় নি। প্রতিদিনই আইন অমান্য, বিক্ষোভ, অবস্থান, সরকারী অফিস অবরোধ প্রভৃতি চলতে থাকে। ইতিমধ্যে ৫ই মার্চ আবার কৃষ্ণনগরে পুলিশ গুলি চালালো। গুলিতে আনন্দ হাইত শহীদ হলেন। এর প্রতিবাদে ১০ই মার্চ সারা বাংলা হরতাল–ধর্মঘটের কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়, পরবর্তীতে ১০ই মার্চে বামপন্থীদের ডাকা ধর্মঘট জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনে পুষ্ট হয়ে সরকারী সন্ত্রাসকে উপেক্ষা করে শেষ পর্যন্ত ৭২ ঘণ্টার সর্বাত্মক বন্ধ-এ পরিণত হল।

খাদ্য আন্দোলনের মধ্য দিয়েই জেলার বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনের কাজকর্মের ক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছিল। '৬৬ সালে কোচবিহার জেলা কংগ্রেসের অধিবেশন বসে ভিক্টোরিয়া কলেজের বিপরীত পার্শ্বে নৃপেন্দ্র নারায়ণ স্কুলের পার্শ্বে লাইনের মাঠে। কংগ্রেসের এই অধিবেশনে যোগ দিতে এসেছিলেন – তরুণ কান্তি ঘোষ, আভা মাইতি, অতুল্য ঘোষ। "নুরুল–আনন্দের খুনী" কংগ্রেসী নেতৃত্বের প্রতি এখানকার ছাত্রসমাজ তুমুল ঘৃণা পোষণ করেছিল। যার ফলস্বরূপ, সেদিন জেলা কংগ্রেসের অধিবেশন ও মিটিং সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ করেছিল সংগঠিত ছাত্রসমাজ। সেদিন সম্মিলিত ছাত্ররোষ কংগ্রেস বিরোধী জনরোষে পরিণত হয়েছিল। ঘটনাস্থলে সেদিনের কংগ্রেসী পুলিশ বাহিনীও নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করতে বাধ্য হয়। আগস্টের দুর্গাপুরে "জব্বর ও আশীষ" কুনের পর কুচবিহার জেন্‌কিন্স স্কুলের মাঠে জেলা কংগ্রেসের আহ্বানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেনের সমাবেশ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল! কিন্তু জেন্‌কিন্স স্কুলের ছাত্ররা মুখ্যমন্ত্রী সেনকে কালো পতাকা দেখায়, কুচবিহারের ছাত্রসমাজ নুরুল, আনন্দ, জব্বর, আশীষের কুনের বদলা নেওয়ার শপথ গ্রহণ করে কালো ব্যাজ ধারণ করেছিল।

এতদিন এখানকার ছাত্র আন্দোলনের মূল শক্তি ছিল ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্ররা। যদিও এই আন্দোলন টেনে এনেছিল কোচবিহারের ব্যাপক সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীদের এবং এই স্কুল পড়ুয়া ছাত্ররাই তখন থেকে জেলার সংগঠিত ছাত্রআন্দোলনের প্রাণশক্তিতে পরিণত হতে শুরু করল। এই সময় জেন্‌কিন্স, নৃপেন্দ্র নারায়ণ, সুনীতি একাডেমী প্রভৃতি স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের এই আন্দোলনে টেনে আনার কাজে ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্বরা একটি বিশেষ দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তখনকার ছাত্রফেডারেশনের উদ্যোগে একটি বিশেষ কর্মসূচী – কোচবিহার সদর এম. জে. এন. হাসপাতাল চৌমাথায় ১২ ঘণ্টার পথ অবরোধ। এই অবরোধ চলাকালীন কোচবিহার সৎকার সমিতির সহায়তায় শ্মশান থেকে মড়ার খুলি নিয়ে এসে আভা মাইতি, অতুল্য ঘোষ, তরুণ কান্তি ঘোষ, সন্তোষ রায়-দের পুত্তলিকা তৈরী করা হয়।

এই জেলার বামগণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে সংহত করতে সাহায্য করছিল এই সময়কার খাদ্য আন্দোলন। মানুষের মনে কংগ্রেসের প্রতি তুমুল ঘৃণার উদ্রেক হয়েছিল। এরই মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় ভিক্টোরিয়া কলেজে ছাত্র-সংসদ নির্বাচন। এই নির্বাচনের প্রাক্কালে ছাত্রফেডারেশন দাবী তোলে ছাত্রী নিবাসের ছাত্রীদের সংসদ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে দিতে হবে এবং মহাবিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন করে বিশ্ববরেণ্য দার্শনিক ও মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যক্ষ 'আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল কলেজ' করতে

হবে। এই সময় বন্দী মুক্তির দাবীতেও কলেজে আন্দোলন সংগঠিত হয়। ফলতঃ ছাত্রসংসদ নির্বাচনে ছাত্রফেডারেশন বিপুল ভোটে জয়ী হয়। এই সময় ছাত্রসংসদের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন – জ্যোতিষ ভৌমিক।

’৬৬-এর ১৫ই নভেম্বর ইন্দিরা সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী অনুপ্রবেশ ঘটায়। ‘ইন্দো-মার্কিন এডুকেশন ফাউণ্ডেশন’ স্কীম-এর প্রতিবাদে ছাত্র সমাজের মিছিল, মিটিং এর মধ্য দিয়ে দেশের আকাশ বাতাস প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠেছিল।

’৬৭ সাল – রাজ্যে প্রথম অকংগ্রেসী সরকার :

খাদ্য চাই, আশ্রয় চাই, কেরোসিন চাই – দাবী উঠলেই শুরু হ’ত গোলাগুলি আর পুলিশ ও জোতদারের সন্ত্রাস। এইরকম এক ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে এল চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন। সেই নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতের আটটি রাজ্যে কংগ্রেস পরাজিত হল। পশ্চিমবঙ্গে গঠিত হল প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার। রাজ্যে প্রথম অকংগ্রেসী সরকার যুক্তফ্রন্ট সরকারকে হাতিয়ার করে এ জেলায় শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনে জোয়ার এল। এই নির্বাচনে সমস্ত বামপন্থী ও অকংগ্রেসী দলগুলি সম্মিলিত মোর্চা গঠন করে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এক হয়ে দাঁড়াতে পারে নি, কিন্তু তা সত্ত্বেও রাজ্যে নির্বাচনে কংগ্রেস পরাজিত হ’ল। মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন নিজেও পরাজিত হলেন। কংগ্রেস জনজীবন থেকে যে কতটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে তা এই নির্বাচনের ফলই পরিষ্কার বুঝিয়ে দিল। শুধুমাত্র পশ্চিম বাংলাই নয় সারা ভারত জুড়ে খাদ্য সঙ্কট ও কংগ্রেস সরকারের দুর্নীতিপরায়ণতা জনবিরোধী শাসননীতির বিরুদ্ধে ’৬৭ এর সাধারণ নির্বাচনে মানুষ রায় দিলেন। কেন্দ্রে কোনমতে ক্ষমতায় টিকে গেলেও পশ্চিমবাংলা, কেরালাসহ আটটি রাজ্যে কংগ্রেস সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভে ব্যর্থ হল। স্বাধীন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এই সমস্ত কারণে ’৬৭-র নির্বাচনকে এক নতুন যুগের সূচনা বলে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। নির্বাচনের ফলাফলের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের শাসন ব্যবস্থায় কংগ্রেসের একচেটিয়া শাসন ও একচ্ছত্র আধিপত্য অবসানের যুগ শুরু হ’ল। কোচবিহারের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কাছে ’৬৭-এর নির্বাচনের তাৎপর্য আরও সুদূর প্রসারী। ’৬৭ সালের নির্বাচনে CPI(M) প্রার্থী দীনেশ চন্দ্র ডাকুয়া তৎকালীন কংগ্রেস সরকারের রাষ্ট্রমন্ত্রী মহেন্দ্র ডাকুয়াকে পরাস্ত করেন। এই দিক থেকে ’৬৭ এর নির্বাচনকেই কোচবিহারের রাজনীতিতে বামপন্থী শক্তির সফলভাবে এগোনোর পথে প্রথম ধাপ বলা যেতে পারে। সেদিন মানুষের নির্দেশ ছিল – বামপন্থী শক্তিগুলি সহ সমস্ত কংগ্রেস বিরোধী দলগুলি এক হয়ে রাজ্য সরকার গঠন করুক। ছাত্রসমাজও এই আকাঙ্খার অংশীদার ছিল। মানুষের এই দাবীকে বাস্তবে রূপ দিতে অজয় মুখার্জীর নেতৃত্বে গঠিত হল প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার। শুরু হল সাধারণ মানুষের সক্রিয় সমর্থন নিয়ে যুক্তফ্রন্টের পথ চলা।

এটা সর্বজনবিদিত যে, ভারতরাষ্ট্র পরিচালিত হচ্ছে পুঁজিপতি সামন্তবাদীদের প্রতিনিধি দ্বারা। সামন্তবাদীরা এই রাজনৈতিক পরিবর্তন দেখে শঙ্কিত হয়ে পড়ল এবং শুরু করল যুক্তফ্রন্ট বিরোধী ষড়যন্ত্র। চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করল যুক্তফ্রন্ট সরকারের মধ্যে। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গকে ভাতে মারার জন্য কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকার কেন্দ্র থেকে চাল, গম যে পরিমাণে পশ্চিমবঙ্গের জন্য বরাদ্দ ছিল তা বন্ধ করে দিল। ফলে পশ্চিমবঙ্গে দেখা দিল প্রচণ্ড হাহাকার। চালের দাম একলাফে পাঁচটাকা কেজি হয়ে গেল খোলা বাজারে। (এর আগে খোলা বাজারে এক টাকা কেজি দরে চাল বিক্রি হত)। রেশন বন্ধ হয়ে গেল। সৃষ্টি হল ভয়ঙ্কর অবস্থার। কিন্তু পশ্চিমবাংলার মানুষ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ

হলেন – " না খেয়ে মরব তবু কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারের কাছে মাথা নত করব না"। তাই কংগ্রেস এদিকে ষড়যন্ত্রের জাল ফেলল অজয় মুখার্জীর দিকে, অপর দিকে ফেলল খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল ঘোষের দিকেও। '৬৭ সালে কতিপয় ব্যক্তি সুযোগ খুঁজতে লাগলেন কি অছিলায়, কত তাড়াতাড়ি 'ঝাঁকের কই ঝাঁকে ফিরে যাওয়া যায়' – প্রথম যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার প্রফুল্ল ঘোষ ছিলেন এদের নেতা। খাদ্যমন্ত্রী হিসাবে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিতে লাগলেন তিনি। স্বাভাবিক কারণেই মানুষের মনে তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষোভ জমে উঠছিল। তাঁকে কেন্দ্র করে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে নতুন চক্রান্ত দানা বাঁধতে লাগল। মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জী এই চক্রান্তে অংশ নিলেন। অক্টোবরের প্রথমে তিনি পদত্যাগে উদ্যোগী হলেন – মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ৪ঠা অক্টোবর গোটা রাজ্যের বামপন্থী ছাত্ররা সম্মিলিতভাবে শ্লোগান তুলেছিলেন – "যুক্তফ্রন্ট ভেঙে দেওয়া চলবে না"। শেষপর্যন্ত ছাত্র ও জনগণের আন্দোলনের চাপে অজয় মুখার্জী পদত্যাগ করলেন না। যুক্তফ্রন্ট সাময়িকভাবে টিকে গেলেও ব্যর্থ হল – কংগ্রেসী চক্রান্ত।

বেইমানদের সরকার ও ছাত্র আন্দোলন :

চক্রান্তের এই রাউণ্ডে কংগ্রেস ব্যর্থ হলেও তারা থেমে থাকল না। দ্বিতীয় পর্যায়ে ষড়যন্ত্রের অংশ হিসাবে প্রফুল্ল ঘোষকে সরাসরি মাঠে নামানো হ'ল। নভেম্বর মাসে প্রফুল্ল ঘোষের নেতৃত্বে কয়েকজন বিধানসভার সদস্য দলত্যাগ করলেন। ফলতঃ যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা একটি কঠিন সঙ্কটের সামনে এসে দাঁড়াল। রাজ্যের ছাত্রসমাজ এগিয়ে এল যুক্তফ্রন্ট রক্ষা করতে। যুক্তফ্রন্ট পতন ঘটানোর চক্রান্তের বিরুদ্ধে প্রফুল্ল ঘোষ সহ বেইমানদের পদত্যাগের দাবীতে ছাত্রফেডারেশন সহ চারটি বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের ডাকে ২২শে নভেম্বর সারা বাংলা ছাত্রধর্মঘট পালিত হয়। ইতিমধ্যে ২১শে নভেম্বর রাত্রিবেলায় রাজ্যপাল ধরমবীর মন্ত্রীসভা না ভেঙেই যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা বাতিল করে দেন।

২১শে নভেম্বর যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা বরখাস্ত হওয়ার পর ২২শে নভেম্বর সকাল তেকেই জেলা জুড়ে ছাত্ররা প্রতিবাদে রাস্তায় নামে, বিশেষ করে ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্ররা ছাত্রফেডারেশনের নেতৃত্বে শহরের বিভিন্ন পথ অবরোধ করে। এই সময় পুলিশ ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্রাবাসের সম্মুখে ছাত্রফেডারেশনের মিছিলের উপর ব্যাপক লাঠি চার্জ করে। ঘটনাস্থলেই বিকাশ সরকার, শুভেন্দু ব্যানার্জী, অমিতেশ দত্তরায়, জীতেন সাহা, স্বরাজয়ী মুখার্জী প্রমুখ নেতৃত্বকে পুলিশ গ্রেফতার করে। পুলিশি আক্রমণে কমল সেন (দেবুদা – প্রয়াত) গুরুতর আহত হন। পরবর্তী সময়ে কলেজ ছাত্রাবাসের ছাত্রদের উপর কংগ্রেসী গুণ্ডা ও পুলিশের প্রত্যক্ষ আক্রমণ নেমে আসে। এই সময় পুলিশ ও গুণ্ডা লেলিয়ে দিয়ে বিভিন্ন আক্রমণ-এর যিনি পরোক্ষ মদত যুগিয়েছিলেন তিনি তৎকালীন হেড-পোস্টঅফিসের সেভিংস ব্যাঙ্ক সেকশনের জনৈক কর্মী। গ্রেফতার হয়ে ছাত্র নেতৃত্বরা জেলে গেলে প্রখ্যাত আইনজীবী ও গণআন্দোলনের নেতা রেবতীরমন ভট্টাচার্য-এর সঙ্গে দেখা হয় (ঐ সময় তিনিও গ্রেফতার হয়ে বন্দী ছিলেন)। সেই সময় জেলখানায় বিভিন্ন ধরণের রাজনৈতিক ক্লাস ও আলোচনা সংগঠিত হতে থাকে। ২০শে ডিসেম্বর থেকে পক্ষকালব্যাপী আইন অমান্যের কর্মসূচী চলতে থাকে। প্রথমদিন ছাত্ররা আইন অমান্য করেন। সেখানে দীপিকা পাঠক, ইন্দিরা রায় সহ অন্যান্য নেতৃত্ব গ্রেফতার হন। ইতিমধ্যে রাজ্যপাল ধরমবীর কোচবিহারে আসেন। তাঁর আগমনকে কেন্দ্র করে ছাত্ররা D.C. অফিস ঘেরাও করেন, বিপুল জনস্রোত পথে নামে ফলে ধরমবীর কোচবিহার ছেড়ে চোরের মত পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। এরপরই ভিক্টোরিয়া কলেজে ছাত্রসংসদ নির্বাচন হয়। ছাত্র ফেডারেশন আবার বিপুল ভোটে জয়ী হয়। এই সময় ছাত্র সংসদের সাধারণ

সম্পাদক – সূর্য ঘোষ এবং সহসভাপতি –সুবোধ মোদক নির্বাচিত হন। সংগঠনের অভ্যন্তরে মতাদর্শগত বিতর্ক বিশেষভাবে উত্থাপিত হতে শুরু করে '৬৭-এর প্রথমার্ধ থেকেই। কুচবিহার-এর ছাত্রআন্দোলনের কর্মীরা এই সময় এক বিশ্বাসঘাতককে চিহ্নিত করে। বহু ঘাত-প্রতিঘাত সত্ত্বেও বহু সংখ্যক ছাত্রছাত্রীর গৌরবজনক অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সে সময় কুচবিহার সহ সারা রাজ্যে যে আন্দোলন রচিত হয়েছিল তার চাপে শেষ পর্যন্ত ঘোষ মন্ত্রীসভার পতন হল। আগামী দিনে ঐতিহাসিক জয়ের আকাঙ্খা নিয়ে এগিয়ে চলল আন্দোলন।

'৬৮ সালের ভয়াবহ বন্যা :

১৯৬৮ সালে জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার জেলায় এই প্রাকৃতিক বিপর্যয় দুই জেলার অর্থনীতিকে বিধ্বস্ত করে। প্রলয়ঙ্করী এই বানে ভেসে যায় জলপাইগুড়ি শহর। ভেঙে যায় কুচবিহার জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা। কৃষকদের ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট এবং বালিচাপা পড়ে হাজার হাজার একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে যায়। বন্যা বিধ্বস্ত কুচবিহার ও জলপাইগুড়ির পুনর্গঠন, খাদ্য ও বিলিফের জন্য গ্রাম শহরের মানুষদের সংগঠিত করা, আন্দোলন গড়ে তোলা – জেলার গণআন্দোলন প্রধান কাজ হিসাবে বেছে নেয়। বন্যাত্রাণে ছাত্র-শিক্ষক ও অধ্যাপকদের সম্মিলিত কমিটি গঠিত হয়। শিক্ষক-অধ্যাপকদের মিলিত ত্রাণ কমিটিতে ছিলেন – অধ্যপক চিত্ত গুহ, সমরেন্দ্র নাথ সাহা, আহুতি রায়, মৃণালকান্তি বর্মন, বিমলকান্তি বসু, কবীন্দ্র সমাজদার প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। এই সময় ছাত্ররা টাকাগাছ, মধুপুর, কালপানিতে ত্রাণ পৌছান।

'৬৮ সালে ছাত্র ফেডারেশনের পঞ্চম জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কুচবিহার গায়েত্রীদেবী বিদ্যালয়ে। সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হন শুভেন্দু ব্যানার্জী ও তারিণী রায়। এই সময় গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের জন্ম হয়। ছাত্রফেডারেশনের জেলা সম্মেলনের প্রকাশ্য সমাবেশ কুচবিহার শহীদবাগ ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন ও সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন রাজ্য সম্পাদক কমরেড সুভাষ চক্রবর্তী। ঐ প্রকাশ্য সমাবেশে ছাত্রদের সংগ্রামের প্রতি সংহতি জ্ঞাপন করতে কমরেড মানিক ব্যানার্জী ও রামসাগর গোয়ালার নেতৃত্বে পরিবহন ও বিদ্যুৎ পর্ষদ শ্রমিকরা মিছিল করে সমাবেশে যোগদান করেন।

মতাদর্শগত অবস্থান – রাজনৈতিক অভিধানে 'নকশালপন্থী' শব্দের সংযোজন :

যুক্তফ্রন্টের আমলেই গণতান্ত্রিক ছাত্র আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্য দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদীরা 'বাম হঠকারিতা'র বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। এই পরিকল্পনার প্রধান বৈশিষ্ট ছিল তিনটি –

১। ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে ছাত্রযুবদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে বাধা তৈরী করা,

২। পশ্চিমবাংলার যুক্তফ্রন্টের মধ্যে বিশেষ করে বামপন্থী শক্তিগুলির মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করা,

৩। কম্যুনিস্ট বিরোধিতা, যুদ্ধবাদীতা, প্রতিরোধ লিপ্সা – এই ধরণের আওয়াজগুলোকে সুকৌশলে প্রকাশ্যে না তুলে ছাত্রযুবদের মধ্যে শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে উসকে দিয়ে স্বাভাবিক আন্দোলনের গতিপথ থেকে ছাত্রযুবদের বিচ্যুত করা এবং বিপ্লবী আন্দোলন সম্পর্কে মানুষের মনে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করা।

গণআন্দোলন তথা ছাত্র আন্দোলনের সামনে বিপ্লবের নামে 'বুর্জোয়া শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস কর', স্কুল-কলেজের ল্যাবরেটরি ও লাইব্রেরী পোড়াও ও 'পরীক্ষা ব্যবস্থার উপর আক্রমণ কর'– এই আওয়াজ তুলে কিছু অস্থিরচিত্ত বিপথচালিত স্কুল-কলেজের ছাত্র এবং সমাজবিরোধীরা এই সমস্ত অভিযানে সামিল হল। বিপ্লবের নাম করে শুরু হল মনীষিদের মূর্তি ভাঙা, সাধারণ কনস্টেবলকে খুন করা এবং গুপ্ত হত্যা।

এই নকশালপন্থা সম্পর্কে দু'একটি কথা জানা প্রয়োজন। '৬৭ সালের প্রথম যুক্তফ্রন্টের আমলে নক্শালবাড়ি এলাকার কৃষক সংগ্রামকে কেন্দ্র করে নক্শালপন্থীর উদ্ভব। ক্ষেত্র প্রস্তুত হবার আগেই 'এখনই বিপ্লব করার সময়' শ্লোগান নিয়ে তাঁরা মানুষের সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন। এইভাবে উপযুক্ত প্রস্তুতির আগেই শত্রুর আক্রমণের মুখে বিপ্লবী আন্দোলনকে ছেড়ে দেওয়ার এই ভ্রান্ত পথ এখানকার বাম আন্দোলন গ্রহণ করেন নি। সেই সময় ওঁরা শ্লোগান তুলেছিলেন – 'চীনের চেয়ারম্যান, আমাদের চেয়ারম্যান', 'গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরো', 'জোতদারদের গলা কাঠা চলছে চলবে' ইত্যাদি। এদের বক্তব্য ছিল দাবী দাওয়া ভিত্তিক গণআন্দোলন বা নির্বাচনে অংশ নেওয়ার মানে মানুষের মনে মোহ সৃষ্টি করা। সুতরাং এগুলিকে ধ্বংস করতে হবে। মুষ্টিমেয় মধ্যবিত্ত যুবক ও ছাত্র ঝাঁপিয়ে পড়লেই বিপ্লব শুরু হবে – এরজন্য কোন দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শ্রমজীবী মানুষকে প্রস্তুত করার দরকার নেই – এটাই ছিল তাঁদের অন্যতম প্রধান বক্তব্য। উল্লেখ্য যে, এই সময় চীনের মহান কম্যুনিস্ট পার্টির ভূমিকা ছাত্রফেডারেশনকে পীড়িত করেছিল।

এই বক্তব্যের একটা আন্তর্জাতিক পটভূমি আছে। ১৯৬৮ সালে ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশে ছাত্র অসন্তোষ প্রায় বিদ্রোহের চেহারা নেয়। এই বিদ্রোহীরা হাজির করল "স্টুডেন্টস্ পাওয়ারের তত্ত্ব"। তাদের মূল বক্তব্য ছিল শ্রমিকরা এবং কম্যুনিস্ট পার্টিগুলি এখন সুবিধাবাদী অভিজাত-এ পরিণত হয়েছে। সুতরাং তারা আর সমাজ বিপ্লবের নেতৃত্ব দিতে পারে না। বরং তারা বিপ্লবের শত্রু। তাই ছাত্রদেরই বিপ্লবের নেতৃত্ব দিতে হবে। বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের মূল তত্ত্ব মার্কসবাদকে এইভাবে নস্যাৎ করার চেষ্টা হ'লো। নক্শালপন্থীরা কার্যতঃ ছিলেন 'স্টুডেন্টস পাওয়ার' এর অবৈজ্ঞানিক ও বিপ্লব বিরোধী তত্ত্বের এদেশীয় প্রতিনিধি। সে কারণেই তারা বলতে শুরু করল " এখন আর কংগ্রেস নয় নয়া শোধনবাদী CPI(M)-ই হ'লো বিপ্লবের প্রধান শত্রু"। সুতরাং আগে তাকে ও তার সহযোগীদের শেষ করতে হবে। পরে অন্য শত্রুর মহড়া নেওয়া যাবে। এইভাবে কংগ্রেস আর নক্শালদের উদ্দেশ্য এক জায়গায় মিলে গেলো। এই সময় এই নক্শালপন্থীরা স্বঘোষিত বৃদ্ধ মার্কিন ছাত্রনেতা মার্কুইস ও পাকিস্তানের ছাত্রনেতা তারিক আলির ভ্রান্ত তত্ত্বের প্রচারক ছিল।

দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট-সংগ্রামের নতুন রাজনৈতিক উপাদান :

১৯৬৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে আবার নির্বাচন। যুক্তফ্রন্ট আবার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হল বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে। '৬৯-এর নির্বাচনের পর আর একসাথে মিলিত হওয়া নয়। বিশ্বাসঘাতক ঘোষ মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্যেই যুক্তফ্রন্ট সংহত হয়েছিল। '৬৯-এর সংগ্রামের জয় মানুষের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের গ্রহণযোগ্যতাকে আরো বাড়িয়ে তুলল। '৬৯-এর নির্বাচনের আগেই যুক্তফ্রন্ট মানুষের সংগ্রামী আশা-আকাঙ্খার প্রতীক হয়ে উঠল। তাই তার ৩২ দফা কর্মসূচীর মধ্যে স্থান পেয়েছিল সেই সব গণতান্ত্রিক দাবী যা কংগ্রেস অতীতে বার বার অস্বীকার করেছে। এইসব দাবীগুলি পূরণে এক দুর্বার সংগ্রাম গড়ে তুলবার আকাঙ্খা নিয়ে পশ্চিমবাংলার মানুষ '৬৭-এর চেয়ে অনেক

বেশী সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়ে যুক্তফ্রন্টকে জয়ী করলেন। ভোটের ফলাফল অনুযায়ী যুক্তফ্রন্ট ২১৯টি আসন, কংগ্রেস ৫৫টি আসন লাভ করে। আগের মতো এবারও অজয় মুখার্জী এবং জ্যোতি বসু যথাক্রমে মুখ্যমন্ত্রী ও উপমুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করলেন। তবে দপ্তর বন্টনে এবার একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটল – স্বরাষ্ট্র দপ্তর আর অজয় মুখার্জীর হাতে থাকল না, এবার তা এল জ্যোতি বসুর অধীনে। লক্ষ্যনীয় আর একটি বিষয় হল – দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্টের মধ্যে বামপন্থীরা প্রথম যুক্তফ্রন্টের চেয়ে শক্তিকে আরো বেশী সংহত করতে সক্ষম হ'লো।

প্রথম যুক্তফ্রন্টের সময় দেখা গিয়েছিল যে সরকারকে সামনে রেখে গণআন্দোলন বিকশিত হতে পারত সেই সংগ্রাম যথাযথভাবে বিকশিত হওয়ার আগেই বিশ্বাসঘাতকদের চক্রান্তে সেই সরকারের পতন হ'ল। বিকাশমান গণআন্দোলনের শক্তির প্রচণ্ড ধাক্কায় চেহারাটা তাই সেদিন টের পাওয়া যায় নি। দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্টের জয়লাভ সমস্ত ধরণের গণসংগ্রামগুলির মধ্যে এক অভূতপূর্ব গতিবেগ এনে দিল। শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকরা বড় বড় সংগ্রাম চালিয়ে মালিকদের অনিচ্ছুক হাত থেকে বহু দাবী আদায় করে নিল। আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়েই যে শ্রমিকরা তাদের দাবী দাওয়া আদায় করে নিতে সক্ষম এতদিন পর্যন্ত পিছিয়ে পড়া শ্রমিকটিত তা উপলব্ধি করলেন। সংগ্রামর ময়দানে জড়ো হতে শুরু করলেন নতুন নতুন যোদ্ধারা – যারা এর আগে পর্যন্ত সবচেয়ে উত্তেজনাপূর্ণ রাজনৈতিক সংগ্রামের সম্পর্কেও উদাসীন ছিলেন। আর এই প্রথম মানুষ অর্জন করলেন এক নতুন অভিজ্ঞতা। তা হল– মালিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম দমন করতে সরকার আর পুলিশ পাঠাচ্ছে না বরং সরকারের অনেক মন্ত্রী কারখানার গেটে এসে শ্রমিকদের উৎসাহিত করে যান। একই চিত্র ছিল গ্রামাঞ্চলেও।

সেদিন গ্রামাঞ্চলের কৃষক সংগ্রামের বিষয়টিও ছিল অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক ভারসাম্য বামপন্থীদের অনুকূলে স্থায়ীভাবে পাল্টে যাওয়া, যুক্তফ্রন্টের সাফল্য ও নতুন স্তরে গণআন্দোলনের উত্তরণ। আবার যুক্তফ্রন্টে ভাঙন – এ সবকিছুরই কারণ দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্টের আমলে গ্রামর কৃষকদের চেতনার বিস্ফোরণ। সেদিনকার সংগ্রাম ছিল – গ্রামের কৃষকদের ফসলের ভাগের লড়াই-এর পাশাপাশি বেনামী জমি উদ্ধারের সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়া। কৃষকরা তাদের সংগ্রামী ক্ষমতার মধ্য দিয়ে সিলিং আইনের কার্যকরী রূপ দিলেন।

শ্রমিক-কৃষকদের এই সংঘবদ্ধ লড়াইএ কম্যুনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) ও তার মন্ত্রীরা সঠিক ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। সেদিনও পার্টির এই সংগ্রামী কার্যকলাপ নস্যাৎ করার চেষ্টা করত বড় বড় সংবাদপত্রগুলি কুৎসার বন্যা বইয়ে। সেদিন চক্রান্ত হয়েছিল শ্রমিক-কৃষকের এই গণসংগ্রামকে কি করে ধ্বংস করা যায়। এই ফ্রন্টকে ধ্বংস করার জন্য বিভিন্ন চক্রান্ত হতে লাগল। রাজনীতির স্বাভাবিক নিয়মে যুক্তফ্রন্টের মধ্যে যারা প্রকৃতপক্ষে ধনীক শ্রেণীর প্রতিনিধি তারা নিজেদের শ্রেণীস্বার্থেই সংগ্রামী শক্তির প্রতিনিধিদের বাদ দিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে বিকল্প সরকার গঠনের অপচেষ্টায় মেতে উঠলেন।

যুক্তফ্রন্ট বিরোধী অপপ্রচার-এ যুক্ত হয়েছিল শুধু এদেশের প্রচার মাধ্যমেই নয়, সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের শক্তিশালী প্রচার মাধ্যম গুলিতেও। যুক্তফ্রন্ট ভাঙার চক্রান্ত প্রতিরোধের সাধারণ সংগ্রামের সাথে যুক্ত হয়েছিল এই জেলার ছাত্র আন্দোলন। জেলার ছাত্র আন্দোলনের সামনে প্রধান শ্লোগান হয়ে উঠল – "যুক্তফ্রন্টকে ভাঙ্গতে দেব না"। যুক্তফ্রন্ট ভাঙ্গার চক্রান্তকারীদের বিরুদ্ধে জেলার

সর্বত্র ছাত্র ফেডারেশন সভা, সমাবেশ ও প্রচার চালাতে লাগল। পাশাপাশি প্রচার চলতে লাগল কংগ্রেস এবং বাজারী কাগজের নির্লজ্জ কুৎসার বিরুদ্ধে।

এই পটভূমিতে শিলিগুড়িতে ২৫–২৮শে ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হল১৯তম রাজ্য সম্মেলন। এই সম্মেলনে স্পষ্ট ঘোষিত হল মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টিকে বাদ দিয়ে বিকল্প সরকার গঠিত হলে ছাত্রসমাজ প্রতিরোধ আন্দোলনে সামিল হবে। ইতিমধ্যে কেরালায় বামবিরোধী শক্তি, কম্যুনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-এর নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে গদিচ্যুত করে কংগ্রেসের সহায়তায় এরকম একটি সরকার গঠিত হল যা রাজ্যের বামফ্রন্ট বিরোধী শক্তিকে উৎসাহিত করেছিল।

দক্ষিণ ভিয়েতনামের বিপ্লবী সরকারের অবিলম্বে স্বীকৃতি ও ভিয়েতনামের মুক্তি সংগ্রামের সমর্থনে জেলার ছাত্র আন্দোলন ব্যাপকভাবে সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত নেয় ছাত্রফেডারেশন। পাশাপাশি অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষার দাবীতে, রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা, শিক্ষাখাতে কেন্দ্রের ব্যয়বৃদ্ধি ও সমস্ত বিদেশী ব্যাঙ্কের জাতীয়করণের দাবীতে আন্দোলন সংগঠিত হতে থাকে। ইতিমধ্যে ৫ই মার্চ যুক্তফ্রন্ট বিরোধী চক্রান্তকারীদের হুঁশিয়ার করে দেওয়ার জন্য ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। ছাত্র ফেডারেশনের থেকে ঘোষণা দেওয়া হয় যুক্তফ্রন্ট ভাঙলে সাথে সাথে সমস্ত বাংলাদেশ অচল হয়ে যাবে। ১৬ই মার্চ রাত্রি ৮টায় বেতার ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জী পদত্যাগ করলেন। পরদিন হরতাল, ধর্মঘট পালিত হয় গোটা রাজ্য জুড়ে। অচল হয়ে যায় গোটা পশ্চিমবাংলা। আর এই একদিনের ধর্মঘটে প্রাণ হারালেন গোটা রাজ্য জুড়ে ২০ জন গণ আন্দোলনের কর্মী।

দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্টের আমলে কোচবিহারের ছাত্র আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ করেছিল। এই সময় ছাত্র আন্দোলনকে অনেকগুলি প্রশ্নের সম্মুখীন হ'তে হয়েছে। ভিতর এবং বাইরের শক্তির আঘাতকে মোকাবিলা করে ছাত্র আন্দোলনকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রচেষ্টা তৎকালীন ছাত্রফেডারেশনের নেতৃত্বরা গ্রহণ করেছিলেন। এই সময়ে একদিকে বাইরের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির আক্রমণ যেমন হচ্ছে তেমনি বিপ্লবের নামে বিপ্লবী আন্দোলনকে ধ্বংস করে দেওয়ার ব্লু-প্রিন্ট সেই সময় রচিত হয়। এই নগ্ন কুৎসিত আক্রমণের হাত থেকে ছাত্র আন্দোলনকে রক্ষা করার জন্য ছাত্রফেডারেশন কুচবিহার জেলা জুড়ে ছাত্র আন্দোলন সংগঠিত করে।

যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে কুচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজে ছাত্রফেডারেশনের নেতৃত্বে তুমুল আন্দোলন সংগঠিত হয়। ভিক্টোরিয়া কলেজে প্রাতঃ বিভাগ চালু, অনুর্ধ ১৮ বছরে P.U. এবং ১৯ বছরে প্রথম বর্ষে ভর্তির নিয়ম সে সময় চালু ছিল। এই আইন পরিবর্তনের দাবীতে তৎকালীন সময়ের ভিক্টোরিয়া কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ S. K. Dutta-কে ছাত্ররা ছয়দিন ঘেরাও করে রাখে। এই ছাত্র আন্দোলনকে ভাঙবার জন্য ছাত্র পরিষদ কলেজের ভিতরে ব্যাপক বোমাবাজি করে। ছাত্র পরিষদের বোমাবাজির ফলে আক্রান্ত হন তৎকালীন ছাত্র ফেডারেশনের রাজ্যের যুগ্ম সম্পাদক জ্যোতিষ ভৌমিক, অধ্যাপক বিমল মুখার্জী ও অধ্যাপক অসিতানন্দ রায়। এই সময় ভিক্টোরিয়া কলেজের এই আন্দোলনকে সংগতি জানাতে জেলা ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে কেন্দ্রীয় ছাত্র সমাবেশ শহীদবাগে অনুষ্ঠিত হয়। সেই সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন সময়কার BPSF-এর রাজ্য সভাপতি বিমান বসু। ছাত্রদের এই আন্দোলনের পাশে সংহতি জ্ঞাপন করেছিলেন পরিবহন শ্রমিক ও L.I.C.-এর কর্মচারীবৃন্দ। ঐ সময় যুক্তফ্রন্ট সরকারের শিক্ষামন্ত্রী সত্যপ্রিয় রায় ছাত্রদের এই দাবীকে সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করে দূরভাষ-এ অধ্যক্ষকে প্রাতঃ বিভাগ খোলার নির্দেশ

দেন এবং P.U. ও প্রথম বর্ষে ভর্তির ক্ষেত্রে বয়সের বাধ্যতামূলক নিয়মটি তুলে দেন।

যুক্তফ্রন্টের সময় খেটে খাওয়া মানুষের স্বার্থে আইন পরিচালনার চেষ্টা চলতে থাকে। কিন্তু এই সময় যুক্তফ্রন্ট বিরোধী শক্তিগুলি বিভিন্নরকম চক্রান্তে লিপ্ত হয়। তারই একটি উদাহরণ সদর মহকুমার পসারিহাট পুড়িয়ে দিয়ে সেখানকার আধিয়ার উচ্ছেদ করে জোতদাররা তাদের ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী দিয়ে। এর প্রতিবাদ করতে গেলে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির কৃষক নেতৃত্বরা গ্রেফতার হলেন। পরবর্তীতে এদের মুক্তির দাবীতে ও পসারিহাটের উচ্ছেদকৃত আধিয়ার বন্ধুদের ত্রাণের দাবীতে ছাত্র ফেডারেশন-এর কর্মীরা S.D.O. অফিস ঘেরাও করেন এবং পরবর্তীতে তারা বিভিন্ন জায়গা থেকে ত্রাণ সমগ্রহ করে পসারিহাট অঞ্চলের জোতদারদের ঠ্যাঙাড়ে বাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত পরিবারবর্গকে সাহায্য করেন।

কোচবিহার সদর মহকুমার দেওয়ান হাটে ছাত্রফেডারেশনের কর্মীরা সংগঠনকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ছাত্র কনভেনশন সংগঠিত করে। কনভেনশন সংগঠিত করার দায়িত্বে ছিলেন দেওয়ান হাট স্কুলের ছাত্র মনোজ ঘোষ। কনভেনশন শেষে মনোজ ঘোষ গুপ্ত ঘাতকের হাতে খুন হন। এই খুনের প্রতিবাদে দেওয়ান হাটে ছাত্র সমাবেশ সংঘটিত হয়। ঐ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন তৎকালীন ছাত্রফেডারেশনের জেলা সম্পাদক তারিনী রায়, বিকাশ সরকার (পুষ্প), প্রমথ সাহা (তৎকালীন দিনহাটা কলেজের ছাত্রসংসদের সাধারণ সম্পাদক)।

"ধনতন্ত্র ভাতে মারে, আঁতে মারে কম্যুনিস্ট তাইতো আমরা প্রাউটিস্ট" – এই শ্লোগানকে সামনে রেখে অবদূত তৈরীর নামে আনন্দমার্গীরা বিভিন্ন স্কুল-কলেজের তারুণ্য পেরিয়ে যৌবনে পদার্পনকারী ছেলেমেয়েদের "প্রাউট" দর্শনের প্রচারের নাম করে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির নেতাদের খুন করার জন্য প্ররোচিত করত। আনন্দমার্গীরা এই সময় কুচবিহারের পোস্টঅফিস পাড়ায়, দক্ষিণ খাগড়াবাড়ী ও সুনীতি রোডে রামানন্দ ভবনে আস্তানা বাধে। এই সময় শহরবাসীর সঙ্গে সারাদিন ধরে এদের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের পর পুলিশ সংগ্রাম সরকার ও বিকাশ সরকার এই দুই ছাত্রনেতা সহ গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয় অমিয় চক্রবর্তী, সুপ্রসন্ন চক্রবর্তী, সমর সাহা প্রমুখের উপর।

'৬৯ সালে ভিক্টোরিয়া কলেজ ও দিনহাটা কলেজের ছাত্রসংসদ নির্বাচনে ছাত্র ফেডারেশন বিপুলভাবে জয়লাভ করে। ভিক্টোরিয়া কলেজের সংসদের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন – ভূবন রায় এবং সহ সভাপতি নির্বাচিত হন – রাজেন্দ্র প্রসাদ বনিক। দিনহাটা কলেজের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন প্রসন্ন সাহা।

'৭০-এর দশক : আধাফ্যাসীবাদী সন্ত্রাস শুরু : SFI-এর প্রতিষ্ঠা : নতুন ধারায় আন্দোলন :

যুক্তফ্রন্টের আমলেই ছাত্র আন্দোলন ও গণআন্দোলনকে ধ্বংস করার কংগ্রেসী পরিকল্পনা রচিত হয়। এই পরিকল্পলাগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করা হল:

দুঃখের হলেও সত্যি যে CPI(M) ও তার সহযোগী খুব ছোট ছোট কয়েকটি বামপন্থী দল ছাড়া কংগ্রেসী চক্রান্তের আসল চেহারা আর কেউ সেদিন ধরতে পারে নি। সমস্ত বামপন্থী দলগুলি এক হতে পারলে যুক্তফ্রন্টের ভাঙ্গন রোধ করা যেত। প্রথম আঘাতেই কংগ্রেসী চক্রান্ত

ব্যর্থ করে দেওয়া সম্ভব হ'ত, কিন্তু তা করা গেল না। একই অবস্থা ছিল ছাত্রআন্দোলনের ক্ষেত্রেও। BPSF ছাড়া অন্য সংগঠনগুলি বেশীর ভাগই ছাত্র আন্দোলনের সামনে নতুন বিপদগুলিকে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছিল। ফলে প্রায় একইভাবে এক সঙ্কটজনক পরিস্থিতির মধ্যে '৭০ দশকের শুরুতে BPSF কে চলতে হল।

যুক্তফ্রণ্টের সময়েই ঐতিহ্যমণ্ডিত ভিক্টোরিয়া কলেজের নাম পরিবর্তন করে বিশ্ববরেণ্য দার্শনিক তথা ভিক্টোরিয়া কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ 'আচার্য্য ব্রজেন্দ্র নাথ শীল'-এর নামে মহাবিদ্যালয়ের নামকরণ করা হয়। ছাত্র ফেডারেশনের এই দাবীটি সাফল্যের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে দাবী আদায়ের পর ছাত্রফেডারেশনের উদ্যোগে বিশেষ বিজয় মিছিল সংগঠিত হয়। '৭০-এ সরস্বতী পূজার দিন রাত্রে মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক অসিতানন্দ রায়কে ছাত্র পরিষদের গুণ্ডারা ছুরিকাহত করে। এর প্রতিবাদে গোটা কুচবিহার হয়ে উঠেছিল 'বিসুভিয়াস'।

'৭০-এর ১৬ই মার্চ মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জী তাঁর সরকারকে 'বর্বর' আখ্যা দিয়ে পদত্যাগ করলেন। পতন ঘটল দ্বিতীয় যুক্তফ্রণ্ট সরকারের। ১৯শে মার্চ জারি হ'ল রাষ্ট্রপতি শাসন অর্থাৎ ব-কলমে কংগ্রেসী শাসননীতিকে ব্যবহার করে সরাসরি আঘাত হানার চেষ্টা হ'ল। জেলার পরিস্থিতি ক্রমশঃ ভয়ঙ্কর হতে শুরু করল। যুক্তফ্রণ্ট ভাঙার পর ১৭ই মার্চ সাধারণ হরতাল সংঘটিত হয়। হরতালের দিন বাজারে একটি খুনকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস ও পুলিশের আক্রমণ নামে গণআন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের উপর। এই আক্রমণের প্রথম শিকার হলেন কুচবিহার রামভোলা স্কুলের শিক্ষক সৌমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ। এই খুনের আসামী চিহ্নিত করে পুলিশ সৌমেন বাবুকে গ্রেফতার করে। তাকে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে অযথা পুলিশি হয়রানির প্রতিবাদে সেদিন রামভোলা স্কুলের ছাত্ররা অনির্দিষ্টকালের জন্য ছাত্রধর্মঘটের ডাক দেয়। তুমুল ছাত্র-শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীদের আন্দোলনের চাপে আটদিন পরে সৌমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষকে আদালত জামিন দিতে বাধ্য হয়।

যুক্তফ্রণ্ট ভাঙনের পর রাজ্যজুড়ে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হলে গোটা শহরে ১৪৪ ধারা অব্যাহত থাকার দরুণ কুচবিহার শহরে কোন প্রতিবাদ সভা সংঘটিত হতে পারত না। এই সময়ে হরেকৃষ্ণ কোঙার ও প্রমোদ দাশগুপ্তের উপস্থিতিতে প্রতিবাদ সভা সংঘটিত হয় বানেশ্বর ও নিউকুচবিহারে। সেদিনের সমাবেশ দুটি থেকে CPI(M) নেতৃত্বরা আহ্বান জানিয়েছিলেন – "অর্জিত সাফল্য ও গণতান্ত্রিক সাফল্য রক্ষা কর, দমননীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াও, সংবাদপত্রের মালিকদের মুখোস খুলে দাও", "অবিলম্বে মধ্যবর্তী নির্বাচন চাই। ৩১শে মার্চ জ্যোতি বসু পাটনায় এক জনসভায় ভাষণ দিতে গেলে পাটনা স্টেশনে তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। অল্পের জন্য তিনি বেঁচে যান, কিন্তু ঘটনাস্থলে কমরেড আলি ইমাম নিহত হন। এই ঘটনার প্রতিবাদে ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়।

এই সময় জেলার আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল – মারুগঞ্জ স্কুলের ছাত্রদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করে সেখানকার কংগ্রেসী নেতৃত্ব। মামলার পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ পরীক্ষার্থী ছাত্রদের গ্রেফতার করে। এদের জামিনের আবেদনের জন্য তৎকালীন ছাত্র ফেডারেশন নেতৃত্ব নরেন দত্ত, দেবু সেন, তারিনী রায় ও অজয় গাঙ্গুলী প্রমুখ SDJM -এর বাড়িতে ডেপুটেশন দিতে যান। সেই সময় কংগ্রেসী গুণ্ডাবাহিনী এদের উপর আক্রমণ করে এবং পরবর্তী সময়ে পুলিশ SDJM -এর নির্দেশে ঘটনাস্থলে তারিণী রায়কে গ্রেফতার করে।

'৭০ সালে কুচবিহার সাগরদীঘির দক্ষিণ দিকে CRP -এর কমাণ্ডিং অফিসার আততায়ীর

হাতে খুন হন। এই খুনের ঘটনায় পুলিশ কম্যুনিস্ট পার্টি ও ছাত্র ফেডারেশনের উপর আক্রমণ চালায়। ছাত্র নেতা দুলাল কুণ্ডু সহ মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির নেতা শিবেন চৌধুরী, গোপাল সাহা, বাসুদেব সাহা ও অখিল দাসের উপর গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়। এঁদের মুক্তির দাবীতে জেলা জুড়ে তুমুল আন্দোলন সংগঠিত হয়। ছাত্রফেডারেশনের উদ্যোগে জেলা জুড়ে 'বিধানসভা ভেঙে দাও, জলগণের রায় নাও, মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার কর' ইত্যাদি দাবীতে ছাত্ররা ব্যাজ পরে এর প্রতিবাদ জানায়। এছাড়াও জেলার বিভিন্ন অঞ্চল জুড়ে প্রতিদিনই খুন, সন্ত্রাস এবং পুলিশ CRP -এর বেপরোয়া নৃশংসতাকে উপেক্ষা করে ছাত্ররা এর প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছিল। এই সময় অতি বিপ্লবী নকশালপন্থীদের প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে নামানো হ'ল। 'বুর্জোয়া শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস কর' আওয়াজ তুলে ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের মর্মর মুর্তিটিকে ভেঙে ফেলল। কিছু অস্থির চিত্ত বিপথচালিত যুবক এই অভিযানে সামিল হ'ল। এদের এই সমস্ত কাজের মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের মনে বামপন্থী আন্দোলন সম্পর্কে অশ্রদ্ধার মনোভাব তৈরী হ'ল এই নকশালরাই ছিল বামবুলির আড়ালে কার্যতঃ বাম আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্য শাসক কংগ্রেসের রাজনৈতিক হাতিয়ার মাত্র।

'৭০ সালের আগস্ট মাসে – জেলার সংগঠিত ছাত্রআন্দোলন-এর ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে – জুন মাসে দশটি রাজ্যের ছাত্রফেডারেশনের নেতৃত্ব মিলিতভাবে সর্বভারতীয় ছাত্রসংগঠন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে নতুন ভাবে উদ্যোগ নিতে শুরু করেন। তারই প্রস্তুতি হিসাবে প্রতিদিন শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করে এবং এক জটিল সংগ্রামে নিয়োজিত থাকা সত্ত্বেও সেদিন এ জেলার ছাত্র আন্দোলনের সংগঠকরা কোচবিহার রামভোলা স্কুলে জেলা ছাত্রসংগঠনের ষষ্ঠ সম্মেলনে মিলিত হন। ঐ সম্মেলন থেকে সম্পাদক নির্বাচিত হন কমরেড তারিণী রায় ও সভাপতি কমরেড কমল সেন নির্বাচিত হন।

কমরেড ভি. আই. লেনিনের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এ. বি. এন. শীল কলেজে ছাত্রফেডারেশনের উদ্যোগে সেমিনার অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। সেই সেমিনারে উপস্থিত ছাত্রছাত্রীদের উপর কংগ্রেসী নেতা সন্তোষ রায়-এর ভাড়াটে গুণ্ডাবাহিনীর আক্রমণ নেমে আসে এবং সেমিনার কক্ষের সামনে তারা বোমাবাজি করে অনুষ্ঠান ভণ্ডুলের জন্য। একই দিনে তুফানগঞ্জের রামপুরে বেনামী ভেস্টেড জমি দখলের আন্দোলন চলতে থাকে। সেখানকার ছাত্রফেডারেশনের কর্মীরা ছাত্র নেতা মিহির গোস্বামী, কার্ত্তিক পণ্ডিত, অষ্টমী মজুমদার – এঁদের নেতৃত্বে জোতদারের ভাড়াটে গুণ্ডাবাহিনীর সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষ হয়। ঘটনাস্থলে তৎকালীন কংগ্রেস নেতা মঙ্গল সরকার ও অক্ষয় বর্মা ছাত্রদের উপর গুলি চালায়। সংগঠিত ছাত্রবাহিনীর কাছে কংগ্রেসী গুণ্ডাবাহিনী ও পুলিশ পর্যুদস্ত হয়। পরবর্তীতে রামপুরের ছাত্রআন্দোলনে তীব্রতা লাভ করে। ঐ সময় রামপুরে ছাত্রদের আন্দোলন পরিচালনার জন্য তৎকালীন এস. এফ. আই.-এর রাজ্য সম্পাদক সুভাষ চক্রবর্তী নিজে উপস্থিত হয়েছিলেন।

SFI -এর প্রতিষ্ঠা :

সংগঠিত ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাসে ১৯৭০ সাল বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ২৭-৩০শে ডিসেম্বর সারাভারত ছাত্র সম্মেলনের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্রের শ্লোগান নিয়ে ভারতের ছাত্রফেডারেশন তৈরী হল। সেদিন কোচবিহার থেকে প্রতিনিধি হিসাবে দেবু সেন (কমল), তারিণী রায়, নরেন দত্ত, বানী রায়, কার্ত্তিক পণ্ডিত ও অনুপম দত্ত প্রমুখ সেই সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন।

SFI -এর প্রতিষ্ঠা কোচবিহারের ছাত্রআন্দোলনকে বিপুলভাবে উৎসাহিত করল। এই

সংগঠন প্রতিষ্ঠার ফলে একটি সর্বভারতীয় আন্দোলনের অংশ হিসাবে কুচবিহারের ছাত্র আন্দোলনের কর্মীদের মধ্যে এই আশা সৃষ্টি হল যে – এখন থেকে কুচবিহার তথা পশ্চিমবাংলার ছাত্রআন্দোলনের উপর কোনরকম হিংস্র আক্রমণ হলে অন্য রাজ্যে ছাত্রআন্দোলনের সহায়তা পাবে। "Study and Struggle" এই শ্লোগানকে সামনে রেখে বিগত ২৫ বছরের সংগঠিত ছাত্রআন্দোলনের ইতিহাসকে কার্যতঃ SFI -এর বিকাশের ইতিহাস বলা যেতে পারে।

'৭১–'৭২ এর ছাত্র আন্দোলন :

নতুন পরিস্থিতিতে ছাত্র আন্দোলনের এই পর্যায়েই '৭১ সালে বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচনের দিন ঘোষিত হয়। বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবাংলার বামশক্তির অনৈক্য এবং সমস্ত ধরণের আক্রমণ সত্ত্বেও কংগ্রেস পরাজিত হয় এবং সি. পি. আই. (এম) সর্ববৃহৎ শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। ছাত্রফেডারেশন এই নির্বাচনে সি. পি. আই. (এম) নেতৃত্বাধীন বামপন্থার পক্ষে কাজ করেছিল।

জাতীয় পর্যায়ে কংগ্রেসের ভাঙন ইন্দিরা কংগ্রেসের সৃষ্টি সমাজতন্ত্র, 'গরিবী হটাও' ইত্যাদি গালভরা শ্লোগান নিয়ে নির্বাচনে কংগ্রেসের আবির্ভাব ঘটল। কিন্তু এত সত্ত্বেও কোন নির্বাচনেই কংগ্রেস এ রাজ্যে জয়লাভ করতে পারল না। প্রমানিত হল যত মিথ্যা কুৎসা রটনা হোক না কেন, যত খুনের অভিযানই পরিচালিত হোক না কেন গণতান্ত্রিক নির্বাচনে প্রকৃত বামশক্তিকে পরাস্ত করা কংগ্রেসের পক্ষে সম্ভব নয়।

'৭১ সালে কুচবিহারের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কয়েকটি বিশেষ পরিস্থিতি দেখা গেল। '৭০ সালের শুরু থেকেই কংগ্রেস দলের নেতৃত্বে জেলার ছাত্রসহ গণআন্দোলনকে ধ্বংস করার ব্লু-প্রিন্ট রচিত হয়। '৭১-এ এসে এই অভিযান তীব্র হ'ল। সন্ত্রাসের ক্ষেত্র প্রসারিত হ'ল। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সংগঠিত গণআন্দোলনের কেন্দ্রগুলির উপর আক্রমণ আরো বেশী কেন্দ্রীভূত হতে শুরু করল। ছাত্রপরিষদ ও যুব কংগ্রেসের ঠ্যাঙারে বাহিনী বিভিন্ন ধরণের আক্রমণ জেলা জুড়ে সংগঠিত করতে থাকে।

'৭১ সালের সাধারণ নির্বাচন – ছাত্রফেডারেশনের উপর আক্রমণ :

'৭১ সালে সাধারণ নির্বাচনের পর মারুগঞ্জে কংগ্রেসের দলীয় কোন্দলে একজন কুখ্যাত সমাজবিরোধী খুন হয়। এই খুনের দায় এড়াতে কংগ্রেসীরা তৎকালীন ছাত্রফেডারেশনের নেতৃত্ব – দীপেন চৌধুরী, নরেন দাস, দিলীপ বিশ্বাস, শিশির গোস্বামী, তপন দেব, সুনীল পালও প্রাণহরি বর্মন এই সাতজন গণআন্দোলনের কর্মীদের হয়রানি করার চক্রান্তে লিপ্ত হয়। এই খুনের ঘটনায় দীপেন চৌধুরী ও দিলীপ বিশ্বাসের উপর নেমে আসে নগ্ন কংগ্রেসী ও পুলিশি অত্যাচার। ইতিমধ্যে ছাত্র নেতা দীপেন চৌধুরী ও দিলীপ বিশ্বাসের মাথার দাম ধার্য করে প্রশাসন ৪৫ হাজার টাকা এবং তাদের গ্রেফতারের জন্য বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ, CRP দিয়ে সংগঠিত প্রশাসনিক বাহিনীর সন্ত্রাস চলতে থাকে। ইতিমধ্যে দীপেন চৌধুরীকে নিশিগঞ্জে ছাত্রপরিষদের সংগঠিত ঠ্যাঙারে বাহিনী খুন করার জন্য ঘিরে ফেলে, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সেই মুহূর্তে DSP সান্যাল সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁকে খুনীদের কবল থেকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসেন কোতোয়ালীতে। পুলিশ লক আপে তাঁর উপর অমানবিক্ অত্যাচার চালায়। ইতিমধ্যে কংগ্রেসী নেতৃত্ব পুলিশকে নির্দেশ দেয় দীপেন চৌধুরীকে খুন করার জন্য। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ কয়েকজন পুলিশের সহায়তায় তিনি কোর্টে হাজির হন। বিচারক তাঁকে তুফানগঞ্জ জেলে স্থানান্তরিত করেন এবং সেখানে তাঁকে বিনা চিকিৎসায় মেরে ফেলার চক্রান্ত

হয়। ইতিমধ্যে এই মামলাটি আশ্চর্যজনকভাবে অন্যদিকে মোড় নেয় অর্থাৎ দীপেন চৌধুরী সহ গ্রেফতার সাত জনেরই যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য ৪৫ বছরে সাতজনেরই দু'বার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয় কেননা, ৩০২/৩৪ ধারা অনুযায়ী যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সময়কাল হল ২০ বছর। এখানেই প্রমানিত হয় – "বিচারের বাণী নিরবে নিভৃতে কাঁদে"।

আধা ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাসের মধ্যেও শিক্ষা ও চাকুরীর দাবীতে, দমননীতির বিরুদ্ধে '৭১-'৭২ এর বিধানসভা নির্বাচন পর্যন্ত যে সমস্ত সংগ্রাম আন্দোলন ছাত্রফেডারেশনকে করতে হয়েছে সেগুলি:

১। বাংলা দেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে ১০ই এপ্রিল ছাত্র-যুব দিবস পালন।

২। ১লা থেকে ৭ই মে 'দমন বিরোধী দাবী সপ্তাহ' পালন।

৩। ২০শে জুলাই 'ভিয়েতনাম সংহতি দিবস' উদযাপন।

৪। ১৮ই আগস্ট কাশীপুর বরানগরে কংগ্রেসী গণহত্যার প্রতিবাদে ছাত্র ধর্মঘট।

৫। মূল্যবৃদ্ধি ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ২৫শে আগস্ট ধর্মঘট ও হরতাল।

৬। ৬ই সেপ্টেম্বর শিক্ষায়তনে নৈরাজ্যসৃষ্টির অপচেষ্টার বিরুদ্ধে 'শিক্ষা বাঁচাও দিবস পালন'।

৭। ৯ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে গণআন্দোলনের উপর শাসক শ্রেণীর নগ্ন আক্রমণের 'প্রতিবাদ দিবস পালন'।

৮। ১৪ই ডিসেম্বর ভারত মহাসাগরে মার্কিন নৌবহর-এর অভিযান-এর বিরুদ্ধে 'ছাত্রযুব প্রতিবাদ দিবস' উদযাপন।

৯। ২৬শে ডিসেম্বর উত্তর ভিয়েতনামে বর্বর মার্কিনী বোমা বর্ষণের প্রতিবাদে ছাত্রযুব দিবস প্রতিপালন।

২৫শে আগস্ট '৭১ সাল – মাথাভাঙ্গায় ছাত্রফেডারেশনের উপর আক্রমণ :

দ্রব্য মূল্যবৃদ্ধি ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ২৫শে আগস্ট সাধারণ ধর্মঘট ও হরতাল পালিত হচ্ছে। একই দিনে গোটা দেশে এস. এফ. আই.-এর ডাকে 'পশ্চিমবাংলা দিবস' পালনের সিদ্ধান্তে মাথাভাঙ্গা শহরে ছাত্ররা মিছিল বের করে। মিছিলের উপর কংগ্রেসী গুণ্ডাদের আক্রমণের ফলে স্থানীয় ছাত্রনেতা ললিত বর্মন ছুরিকাহত হন। এরপর কংগ্রেসী গুণ্ডাবাহিনীর সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষের সময় এক কংগ্রেসী গুণ্ডা খুন হয়। কংগ্রেস দল ও পুলিশ উক্ত খুনের পরিপ্রেক্ষিতে সোহনলাল ভাদানী, দীনেশ ডাকুয়া সহ ছাত্রনেতা ললিত বর্মন, শ্যামল ভট্টাচার্য গ্রেফতার হন। আত্মগোপন করেন ছাত্রকর্মী দেবাশীষ দাস ও নাগরাজ ভাদানী। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য–সেদিন সেই খুনের মামলায় মাথাভাঙ্গা হাই স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র ললিত বর্মনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়।

শিক্ষাক্ষেত্র ও শিক্ষকের উপর আক্রমণ :

'৭১-এর সন্ত্রাস-এর ক্ষেত্র এত বেশী প্রসারিত হল – ছাত্রপরিষদ ও যুবকংগ্রেসের ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকদের উপর আক্রমণ আরো বেশী কেন্দ্রীভূত করল। রামভোলা স্কুলে শিক্ষক সৌমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, কবীন্দ্র সমাজদার, ডঃ দ্বিগ্বীজয় দে সরকার, বিনয় ভৌমিক, নির্মলেন্দু রায় প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের নয়মাস বিদ্যালয়ে প্রবেশের অধিকার ছাত্রপরিষদ ও যুবকংগ্রেস

জোর করে কেড়ে নিয়েছিল। এই সময় নয়মাস ধরে শিক্ষকরা কোন বেতন পান নি। যার ফলস্বরূপ শ্রদ্ধেয় ক্ষিতীশ চৌধুরী বিনা চিকিৎসায় মারা যান। কংগ্রেসী খুনে বাহিনী যে কত নির্মম-নিষ্ঠুর তার নিকৃষ্টতম প্রমান মেলে '৭১ এর ১৫ই নভেম্বর দুর্গাপুর এম. এ. এম. সি. স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিমল দাশগুপ্তকে ক্লাসের মধ্যে চেয়ারের সাথে বেঁধে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং দুবৃত্তরা ঘরের দরজায় তালা ঝুলিয়ে দেয়। অগ্নিদগ্ধ হয়ে বিমল দাশগুপ্তের মৃত্যু হয় এবং সেখানেই ঐ স্কুলের একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী আলপনা এদের হাতে আক্রান্ত হন। এ সবের প্রতিবাদে এস. এফ. আই. ৬ই সেপ্টেম্বর 'শিক্ষা বাঁচাও দিবস' পালন করে।

সাম্রাজ্য বিরোধী বিভিন্ন কর্মসূচী :

ভিয়েতনামে আমেরিকার আগ্রাসনের অন্যতম খলনায়ক ম্যাকনামারার কলকাতা আগমনের বিরুদ্ধে এস. এফ. আই. সারা বাংলায় প্রতিবাদের ডাক দেয়। কলকাতা বিমান বন্দরে অযুত ছাত্রের প্রতিবাদে ম্যাকনামারার বিমান কলকাতার মাটি স্পর্শ করতে পারে নি। ছাত্রফেডারেশন সারা বাংলায় ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দেয়। কুচবিহারেও পালিত হয় ধর্মঘট। পাশাপাশি বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধ শুরু হওয়ার সাথে সাথেই ২৭শে মার্চ ছাত্রধর্মঘট পালিত হয়। ভিয়েতনাম, কাম্পুচিয়ার মুক্তি যুদ্ধের সমর্থনে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন কর্মসূচীতে কুচবিহারের ছাত্রসমাজ হিংস্র আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়েও তাদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মেজাজ বজায় রেখেছিল।

এই সামান্য কয়টি কর্মসূচী দ্বারাই ছাত্র আন্দোলনের মনোভাব বোঝা যায়। এই সময়ে প্রথমে নকশাল পরে ছাত্রপরিষদ শিক্ষায়তনের পবিত্রতা, সুস্থ পরিবেশ ধ্বংস করার গভীর চক্রান্তে লিপ্ত। শিক্ষাকে বাঁচানো ও শিক্ষায়তনের সুস্থতা ফিরিয়ে আনার কাঝে ছাত্রফেডারেশনের কর্মীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

'৭২ এর জাল নির্বাচন :

'৭১ এর সাধারণ নির্বাচনে এ রাজ্যে কংগ্রেস পরাজিত হয়েছিল কিন্তু সেদিন সি. পি. আই. (এম) এর নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্টকে মন্ত্রীসভা গড়তে দেওয়া হয় নি। সংখ্যালঘু কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও দলত্যাগী অজয়মুখার্জীরা একযোগে মন্ত্রীসভা গঠন করল, কিন্তু প্রবল গণআন্দোলনের চাপে তিনমাসের মধ্যে মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে গিয়েছিল। জারি হয়েছিল রাষ্ট্রপতিশাসন। প্রায় একবছর ধরে দীর্ঘ সন্ত্রাস চালিয়ে কংগ্রেস '৭২ সালের ১১ই মার্চ নির্বাচন ঘোষণা করল। এই নির্বাচনে অনিবার্য পরাজয় হবে জেনেই কংগ্রেস সুষ্ঠ অবাধ নির্বাচন না করার পরিকল্পনা সাজিয়েছিল। পুলিশ ও সমাজবিরোধীদের ব্যবহার করে বুথ দখল, প্রশাসনকে ব্যবহার করে ব্যাপকহারে ব্যালট বাক্স বদলসহ সমস্ত ধরণের কারচুপির পথ অবলম্বন করল। লোক দেখানো নির্বাচনের মধ্য দিয়ে কংগ্রেস দল রাজ্যে ক্ষমতাসীন হল। এই সাজানো নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সন্ত্রাসের শাসনকে স্থায়ী সরকারী আবরণ দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল।

সন্ত্রাস মোকাবিলায় ছাত্র আন্দোলন :

'৭২ এর নির্বাচনের পর কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে এ জেলায় ছাত্রআন্দোলনকে চলতে হয়েছে। '৭০-'৭১ এর বিভিন্ন আক্রমণকে ব্যর্থ করে ছাত্রআন্দোলনের শ্রেষ্ঠ কর্মীদের রক্ষা করাটাই সংগঠনের প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই সময় জেলা সংগঠনের শ্রেষ্ঠ সমগঠক – অনুপম দত্ত,

দিলীপ বিশ্বাস, স্বপন রাউত, দীপেন চৌধুরী, ললিত বর্মন প্রমুখ দমদম বা বহরমপুর জেলে বন্দী। সময়টা ছিল কঠিন সঙ্কটময়। বেশীরভাগ স্থানে সংগঠনের কর্মীরা প্রকাশ্য কাজের যতটুকু সুযোগ পেত তাকে ব্যবহার করার পাশাপাশি সম্পূর্ণভাবে শত্রুর মোকাবিলা করার সাংগঠনিক কায়দা রপ্ত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। শত্রুর আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়ে কখনো কখনো নিজের শক্তিকে সংহত করে পিছু হটে আসাটাও যে বিপ্লবী আন্দোলনকে শিখতে হয়, একথা সংগঠনের সর্বস্তরের কর্মীদের বোঝানো হয়েছে।

শিক্ষা জীবনে সুস্থতা, গণতান্ত্রিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা দাবীর সমর্থনে আন্দোলন সংগঠিত করা এবং ছাত্রজীবনে আন্দোলনের মানসিকতাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে ঐ সময় প্রতিটি সুযোগকে কাজে লাগানো হয়েছে। '৭২ এর অক্টোবর মাস-এ জেলা জুড়ে খাদ্যের দাবীতে আন্দোলন এবং দ্রব্যমূল্য বিরোধী আন্দোলন, রাজনৈতিক বন্দীমুক্তির দাবীতে সংগ্রাম এই সমস্ত প্রতিটি কর্মসূচীতেই এ জেলার ছাত্রফেডারেশনের কর্মীরা সক্রিয় অংশ নিয়েছিল। এর মধ্য দিয়েই সন্ত্রাস কবলিত এ জেলায় নতুন করে যোগাযোগ স্থাপনের পথ কিছুটা খুলে গেল।

সপ্তম জেলা সম্মেলন :

সন্ত্রাস মোকাবিলা করার জন্য জেলার ছাত্র আন্দোলনের কর্মীদের সংহত করতে এস. এফ. আই. সপ্তম জেলা সম্মেলন '৭৩ সালে কোচবিহার সেবাভবন বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সম্মেলন উপলক্ষ্যে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবীতে নিউটাউন পোস্টঅফিসের মাঠে ছাত্র সমাবেশ হয়। সমাবেশের অন্যতম বক্তা ছিলেন শ্যামল চক্রবর্তী। সন্ত্রাস মোকাবিলা করে কোচবিহার দীপ্তি সংঘের সদস্যরা সম্মেলনকে সফল করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন। এই সম্মেলন থেকে সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হল – কমল সেন (দেবুদা), ও রমাপতি গুপ্তচৌধুরী (রমল)।

'৭৪ এর ছাত্র আন্দোলন : কাগজ, খাতা, কেরোসিন সরবরাহ-এর দাবী :

'৭৪ এর ২–৫ই জনুয়ারী এস. এফ. আই.-এর দ্বিতীয় সর্বভারতীয় সম্মেলন কলকাতার ত্যাগরাজ হলে অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী শিক্ষা নীতির বিরুদ্ধে একটি বিকল্প শিক্ষা প্রস্তাব গ্রহণ। '৭৪-এর সম্মেলনের পর জেলায় নতুন করে ছাত্র আন্দোলনের পরিকল্পনা রচিত হল। ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাস জুড়ে মহকুমা স্তরে বিক্ষোভ কর্মসূচী পালন, এপ্রিলে সস্তাদরে কাগজ, কেরোসিন সরবরাহ এবং মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা ইত্যাদি প্রধান দাবীর ভিত্তিতে ৭ই এপ্রিল এ জেলাতেও আইন অমান্য করা হয়। এই আইন অমান্যের কর্মসূচীতে আলিপুরদুয়ারের ছাত্ররা এই জেলার কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আইন অমান্যকারী ছাত্রদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়। এই সময় কংগ্রেসী গুণ্ডাবাহিনী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ছাত্রীদের উপর আক্রমণ করার চেষ্টা করে। ছাত্রী নেত্রী বাসন্তী দে-র নেতৃত্বে জয়া চক্রবর্তী, বন্যা চক্রবর্তী, বানী রায়, কাজলদি সহ বহু ছাত্রীকে পুলিশ গ্রেফতার করে। ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশে ১৯দিন এদের জেলে রাখা হয়। ছাত্রদের উপর বর্বর কংগ্রেসী ও পুলিশি আক্রমণের প্রতিবাদে ৯ই এপ্রিল ছাত্রধর্মঘট পালিত হয়।

'৭৪-এর ঐতিহাসিক রেলশ্রমিক ধর্মঘট :

সারা দেশের রেলশ্রমিকরা বিভিন্ন দাবীতে ইন্দিরা সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত

করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ৮ই মে থেকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য 'রেলের চাকা বন্ধ'। ১লা মে – ঐতিহাসিক শ্রমিক সংহতি দিবসে এস. এফ. আই.-এর নেতৃত্বে ছাত্ররা মিছিল করে কোচবিহার রেলস্টেশনে রেল শ্রমিকদের পাশে সংহতি জ্ঞাপন করতে আসছিল। স্টেশন মোড়ে স্থানীয় কংগ্রেসী গুণ্ডারা ছাত্র ফেডারেশনের মিছিলের উপর আক্রমণ করতে এলে মিছিলে অংশগ্রহণকারী জেনকিন্স স্কুলের ছাত্ররা পাল্টা প্রতিরোধে এগিয়ে আসে। এতে তৎকালীন কোচবিহারের কংগ্রেসের কুখ্যাত গুণ্ডারা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। ৮ই মে থেকে ২০ দিন ব্যাপী ধর্মঘট চলাকালীন জেলার ছাত্রফেডারেশনের কর্মীরা ধর্মঘটী শ্রমিক পরিবারের পাশে থেকে বিভিন্নভাবে ত্রাণ সংগ্রহের কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল।

২৭সে আগস্ট – কংগ্রেসী শাসনের নগ্নরূপ উম্মোচন :

কংগ্রেস শাসনের নগ্নরূপ কোচবিহারের মানুষ আর একবার প্রত্যক্ষ করল '৭৪-এর ২৭শে আগস্ট। কোচবিহার জেন্‌কিন্স স্কুলের শিক্ষক শঙ্কর প্রসাদ চক্রবর্তীকে বর্বর CRP গুলি করেন। এই ঘটনায় কুচবিহার শহর সহ জেলার সর্বত্র ছাত্ররা উত্তেজিত হয়ে পড়ে। এই ঘটনার প্রতিবাদে পরদিন কুচবিহারে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়। মাথাভাঙ্গা শহরে ধর্মঘটের প্রচার করতে গিয়ে শহরের জনপ্রিয় সংগ্রামী ব্যক্তিত্ব ও প্রতিথযশা আইনজীবী কমরেড রেবতীরমণ ভট্টাচার্য কংগ্রেসী গুণ্ডাবাহিনীর হাতে নির্মমভাবে নিহত হল। পরবর্তীতে অর্থাৎ ২৮শে আগস্ট শ্রদ্ধেয় শিক্ষক শঙ্কর প্রসাদ চক্রবর্তীও মারা যান। এই ঘটনাদ্বয়ের পরিপ্রেক্ষিতে কুচবিহারের রাজনৈতিক পরিমণ্ডল অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। প্রতিবাদমুখর শহরের ছাত্রসমাজ প্রশাসনকে স্তব্ধ করে দেয়। জেলা জুড়ে আওয়াজ ওঠে –"CRP তুমি বাংলা ছাড়ো"। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পূর্ণাঙ্গ তদন্তের জন্য তৎকালীন কংগ্রেস সরকার 'তারাপদ মুখার্জী' কমিশন তৈরী করে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল – এই কমিশন কোচবিহারে এসে কংগ্রেসী নেতা সন্তোষ রায়-এর নির্দেশেই চলতে থাকে। কমিশনের নিরপেক্ষতার দাবীতে বামপন্থী ছাত্রসংগঠনগুলি মিলিতভাবে ছাত্র ধর্মঘট ও সাধারণ ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। ধর্মঘটের দিন নরেন দত্ত, অমিতেশ দত্তরায়, রিয়াজুল হক, দুলাল কুণ্ডু, অশোক রায় (সেন্টু), মোহন লাল মণ্ডল, আলি হোসেন, দীপেশ বৈশ্য প্রমুখ ছাত্র-যুব নেতৃত্বকে পুলিশ গ্রেফতার করে। এই আধা ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাসের মোকাবিলা করে '৭৪ সালে কোচবিহারের ছাত্রআন্দোলন এক অভূতপূর্ব নজির স্থাপন করে।

ইতিমধ্যে সারা দেশের সঙ্গে কোচবিহারেও কংগ্রেস জনগণের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। জেলার সর্বত্র মানুষের ক্ষোভ আন্দোলনের চেহারা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল। '৭৪ এর শেষভাগ থেকে শুধু বামপন্থীরাই নয় যে কোন বিরোধী দলই কংগ্রেসীদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হল। এমনকি কংগ্রেসের মধ্যকার প্রগতিশীল লোকেরাও এই আক্রমণ থেকে রেহাই পান নি। এ সময় সমস্ত দেশ জুড়ে কংগ্রেস বিরোধী আন্দোলনের নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের দাবীতে সারা দেশে আন্দোলন সংঘটিত হতে থাকে।

'৭৫ এর প্রথমভাগ জুড়ে গুজরাট ও বিহারের ছাত্র আন্দোলনকে কেন্দ্র করে আমাদের এখানেও এই প্রশ্ন উঠেছিল যে – 'ছাত্র আন্দোলন কোন পথে পরিচালিত হবে'? এস. এফ. আই. এই প্রশ্নের সঠিক বিশ্লেষণ এই ভাবে করল – "পশ্চিমবাংলা অনেকদিন আগেই ঐ স্তর অতিক্রম করে আন্দোলনের নতুন স্তরে প্রবেশ করেছে, সুতরাং, এখন আর পিছিয়ে যাওয়ার কোন প্রশ্ন

আসে না।" এই অবস্থানের উপর দাঁড়িয়ে ইন্দিরা সরকার গণতন্ত্রের সামান্য সুযোগটুকু কেড়ে নিতে উদ্যত হল। ২৬শে জুন জারি হল জরুরী অবস্থা, গণতন্ত্রের শেষ চিহ্নটুকুও সাময়িকভাবে মুছে গেল, শুরু হল অন্ধকারের যুগ।

শাসক শ্রেণীর আগ্রাসী রূপ :

'৭৫ সালের মাঝামাঝি সময় থেকেই আধা ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাসের ফলে সংগঠনের একাংশ নেতৃত্ব গোপনে কাজকর্ম চালাতে থাকেন। এই পর্বে আধা ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাস ও ইন্দিরা সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন সংগ্রাম পরিচালনার জন্য কোচবিহার নাট্যসংঘে জেলা ছাত্র ফেডারেশনের এক কনভেনশন থেকে নরেন দত্তকে আহ্বায়ক করে শ্যামল ভট্টাচার্য, বাসন্তী দে, সুচরিতা গুহ, নিতাই সরকার এঁদের নেতৃত্বে জেলা ব্যাপী ছাত্রআন্দোলন সংগঠিত হতে থাকে।

এই সময় দেশজুড়ে শতশত মানুষকে বিনা বিচারে বন্দী করা হল। পরিবার পরিকল্পনার নামে গণহত্যা, কদর্যতম প্রেস সেন্সরশিপ, ৪২তম সংবিধান সংশোধনের দ্বারা স্বৈরাচারী ক্ষমতাকে আইনসিদ্ধ করা – এসবই ছিল জরুরী অবস্থার বৈশিষ্ট্য। এই সময় এস. এফ. আই. এর পক্ষে প্রকাশ্যে কাজ করা সম্ভবপর ছিল না। তবে এই সময় সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের সাথে যোগসূত্র স্থাপনের উদ্দেশ্যে ছাত্র-যুব ফেডারেশনের উদ্যোগে জেলা জুড়ে সুকান্ত-নজরুল জন্মোৎসব পালন করা হয়। এই অনুষ্ঠানের সাফল্য সে সময় কর্মীদের মনোবল বাড়িয়ে দিয়েছিল। এই ভাবে স্থানীয় কর্মসূচীর ভিত্তিতে এস. এফ. আই. ছাত্র আন্দোলনের শক্তিকে আগামী সংগ্রামের জন্য বাঁচিয়ে রাখার জন্য এই কৌশল গ্রহণ করা হয়েছিল। যে কোন পরিস্থিতিতে সংগঠনের কাজ চালাতে হবে এটাই ছিল মূল কথা।

এই সময় কংগ্রেস, পুলিশ, CRP কোচবিহারের প্রতিটি গ্রামে যৌথভাবে আক্রমণ করে। গ্রামাঞ্চল পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছিল এই পিশাচের দল। সে সময়ের ছাত্র আন্দোলনের কর্মীরা ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন - "কংগ্রেস, পুলিশ, CRP -এর ভয়াল চেহারা যতটা মনে পড়ে, তার থেকে বেশী মনে পড়ে প্রাক্তন বিচারপতি মুল্লার (এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি) কথা – 'ভারতবর্ষে যদি কোন সংগঠিত গুণ্ডাবাহিনী থেকে থাকে তাহলে সেই সংগঠিত গুণ্ডাবাহিনী হল পুলিশ। এতবড় সংগঠিত গুণ্ডাবাহিনী আর একটিও নেই ভারতে'। 'শাসক শ্রেণীর এই সন্ত্রাস কি আমরা চোখে দেখব' – একথা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বারবার উচ্চারিত হয়েছে – এই সন্ত্রাস আমাদের নয়, শাসক শ্রেণীর দুর্বলতারই প্রকাশ'।

শাসক কংগ্রেস এ সবের মধ্য দিয়ে এত ঘৃণিত এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। তখন যে কোন মানুষকে "আপনি কংগ্রেসী বা কংগ্রেস করেন" – বললে তাকে গালাগালি করা হচ্ছে বলে মনে করতেন। ঐ সময় সুস্থ, স্বাভাবিকভাবে বাঁচার দাবী করতে গিয়ে শিক্ষককে প্রাণ হারাতে হয়েছে, খাদ্য চাইতে গিয়ে মা'কে প্রাণ হারাতে হয়েছে, শিক্ষার অধিকার দাবী করতে গিয়ে ছাত্রকে প্রাণ দিতে হয়েছে, চাকরীর দাবী করায় যুবককে প্রাণ দিতে হয়েছে – সুতরাং এই শাসক কংগ্রেস যে হিংস্রাশ্রয়ী, সে সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

সংগ্রামপ্রিয় কোচবিহারের ছাত্রসমাজ - সংগ্রামী সুরের অনুরণন তাঁদের শিরায় শিরায়। কোচবিহার-এর ছাত্রসমাজের আপোসবিরোধী মনোভাব-এর জন্য অত্যাচারের স্টীম রোলার ছাত্র সংগ্রামের গতিকে স্তব্ধ করতে পারে নি বরং মহাকবি কীটস্-এর – "Thou ways not for death, immortal bird" এই অমর শব্দগুলির মধ্য দিয়ে এ জেলার আন্দোলনের শক্তি দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেয়েছে। শত্রুর নগ্ন আক্রমণ মোকাবিলা করে এ জেলার সংগ্রামী ছাত্রসমাজ এগিয়ে এসেছিল মানুষের সংগ্রামী আকাঙ্খার এক ইতিহাস তৈরী করতে।

'৭৭ এর নির্বাচন – স্বৈরাচারী শক্তির পরাজয় : আন্দোলনের ভিন্নতর অবস্থা :

জরুরী অবস্থা অবসানের পর অবরুদ্ধ কোচবিহারের ছাত্র আন্দোলন এক নতুন শক্তি সঞ্চয় করে নিজেকে প্রকাশ করল। সন্ত্রাসের আবহাওয়া কেটে যাওয়ার পর বাঁধভাঙ্গা উচ্ছ্বাসের মতো জেলার ছাত্রসমাজ আন্দোলনে এগিয়ে এল। ইতিমধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় লনে ঐতিহাসিক ছাত্র সমাবেশ থেকে নতুন যুগের ছাত্র-আন্দোলনের সূচনা হল। তখনও পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় নি। জেলার ছাত্রসমাজ 'রাজবন্দীদের মুক্তি এবং সাজানো বিধানসভা ভেঙ্গে দিয়ে নতুন করে নির্বাচন' – এই দাবী সামনে রেখে আন্দোলন গড়ে তুলল। অবশেষে জুন মাসে বিধানসভা নির্বাচন হল – রেকর্ড সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বামপন্থী ফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হল। এই প্রথম কুচবিহারের ৯টি আসনেই বামফ্রন্টের প্রার্থীরা জয়ী হলেন। জনগণ মন থেকে কংগ্রেসকে মুছে ফেলে । এই নির্বাচনে SFI বামফ্রন্টকে জয়ী করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল। বামফ্রন্ট সরকারের কর্মসূচী হিসাবে ৩৬-দফা কর্মসূচী '৭৭ এর নির্বাচনের প্রাক্কালে গৃহীত ও ঘোষিত হয়। এর মধ্যে শুধু শিক্ষার অগ্রগতির স্বার্থেই ৬-দফা । শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট প্রায় সবটাই বাস্তবে রূপান্তরিক করতে সরকার আন্তরিকভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে ঘোষিত কর্মসূচীর বাইরে অনেক উৎসাহ-ব্যঞ্জক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। গণতান্ত্রিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাক্রম চালু হয়েছে নানা স্তরে। শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা কমিশনের পরামর্শ অনুযায়ী নতুন ভাষানীতি, পাঠক্রম মূল্যায়ণ প্রথা চালু হয়েছে। এই পাঠ্যসূচীর লক্ষ্য হল – সমাজের পশ্চাৎপদ অবহেলিত মানুষের কাছে কুসংস্কারমুক্ত বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাকে পৌঁছে দেওয়া । সীমিত ক্ষমতার মধ্যে দাঁড়িয়ে বামফ্রন্ট ছাত্র মননে উপযোগী পাঠক্রম প্রবর্তন করেছে। শ্রেনী বিভক্ত সমাজে প্রগতিশীল নীতি কায়েমী স্বার্থান্বেষীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। এই সরকারের কার্যাবলীর মধ্যে কায়েমী স্বার্থবাদীরা তাদের অর্থনৈতিক সামাজিক স্বার্থের ক্ষতিকর উপাদানগুলি লক্ষ্য করেছে। তাই তারা আজও মরিয়া।

বামফ্রন্ট সরকারে আসীন হওয়ার পর এ বছর আঠারো বছরে পদার্পন করল। এই ১৮ বছরের ছাত্র-আন্দোলন এমন কিছু মূল্যবান অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে, যা আগের ৩২ বছরে সঞ্চয় করা সম্ভব ছিল না। জেলার সংগঠিত ছাত্র-আন্দোলনের ৫০ বছরে প্রায় দুই পঞ্চমাংশ সময় জুড়েই আমরা এই নতুন অবস্থার মধ্যে আছি। এই সময়টা সংগ্রামহীনতার সময় নয়। বরং বলা যেতে পারে বামফ্রন্টকে পাশে রেখে ছাত্র-আন্দোলন আরও ব্যাপক হয়েছে। যেহেতু, প্রক্রিয়াটি এখনো বর্তমান তাই এর অতীত ইতিহাসের বিষয়ে পরিণত হয় নি । এই অভিজ্ঞতাটি সম্পর্কে শেষ কথা বলার সময় এখনো আসে নি। বামফ্রন্ট এবং ছাত্র-আন্দোলনের সম্পর্ক নিয়ে প্রতিদিন শত শত আলোচনা হচ্ছে সুতরাং এই সময়কালে ছাত্র-আন্দোলনের অতি বিস্তীর্ণ বর্ণনা দেওয়ার কোন চেষ্টা আমরা করছি না। কেবলমাত্র কয়েকটি সাধারণ অভিজ্ঞতার মধ্যে আমরা অভিজ্ঞতাকে সীমাবদ্ধ রাখতে চাই।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকারের জনস্বার্থমুখী কাজের আন্তরিক প্রচেষ্টা রাজ্যের বামপন্থীদের প্রতি সাধারণ মানুষের সমর্থনের ভিত্তি তৈরী করেছে। তার প্রতিফলন '৮২ এর নির্বাচন, '৮৭ ও '৯২ এর বিধানসভা নির্বাচনে ঘটেছে। এই সমর্থনে দিকটা ইতিবাচক।

বামফ্রন্ট প্রতিষ্ঠার পর ছাত্র-আন্দোলনের স্বতঃস্ফূর্ততা পরিলক্ষিত হয়। স্কুল কলেজে শিক্ষার সুস্থ পরিবেশ ফিরিয়ে আনা এবং কলেজের ছাত্র সংসদ নির্বাচনগুলিতে রাজনৈতিক কারণে SFI এর জয় ছিল সুনিশ্চিত। বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সরকারী পীড়নযন্ত্রকে কিছুটা

ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হয়েছে এবং গণচেতনা বৃদ্ধির এক বিরাট সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। '৭৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচন, '৮০ সালের লোকসভা নির্বাচন, '৮১ সালের পৌরসভা নির্বাচনের পর এনিয়ে সংশয়ের কোন অবকাশ রইল না ।

এই সময়কালের মধ্যে বামফ্রন্ট সরকারের গণমুখী দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাপক ছাত্র সমাজের মধ্যে উৎসাহ সঞ্চার করলেও সরকারের সীমাবদ্ধতা এবং এক শ্রেনীর আমলাতন্ত্রের বিষয়টি বোঝানোর ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে। বামফ্রন্টের কাজকর্মের মধ্য দিয়ে বুর্জোয়া সংবিধান এবং শ্রেনী ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা প্রকট হয়েছে । বামফ্রন্টের রাজনীতি যদি শুধু পাইয়ে দেবার রাজনীতি হ'ত তবে সমস্যা হ'ত গভীরভাবে । যে বর্গাদার, জমির, প্রান্তিক কৃষক অজ্ঞানতা ও হীনমন্যতার অতল গহ্বর থেকে বেরিয়ে এসেছে তাদের আর পূর্ববৎ অবস্থায় ফেরত পাঠানোর সম্ভব নয়, গণতন্ত্র, মর্যাদাবোধ আজ আর আকাশ কুসুম নয়। বামফ্রন্ট সরকার মানুষের সরকার — তাই প্রত্যাশা বৃদ্ধি পাবার সম্ভবনাও স্বাভাবিক । প্রত্যাশা বৃদ্ধি কোন অশুভ লক্ষণ নয় বরং জীবনধারা পাল্টাবার বা রাজনৈতিক সংগ্রামের মানসিকতা প্রশস্ত হয়। কিন্তু উর্ধ্বগামী প্রত্যাশা সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রিত না হলে হতাশার জন্ম হয়। স্বাভাবিকভাবেই ছাত্রসহ সাধারণ মানুষকে বামফ্রন্ট সরকার কি দিতে পারবে কি পারবে না; অর্থনীতিক ভাণ্ডার এবং আমলাতান্ত্রিক জটিলতা কেন্দ্রের বৈষম্য, শ্রেনী-বিভক্ত সমাজের নিয়মকানুন ইত্যাদি বোঝানো জরুরী। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ আজও প্রাসঙ্গিক । কারণ, এই রাজনৈতিক বক্তব্য উপলব্ধির প্রশ্নে সাধারণ মানুষ বামফ্রন্ট সরকারকে নিয়েই খুশি থাকবে না, বৃহত্তর সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবে এবং লড়াই-এর মানসিকতা সৃষ্টি হবে। স্বভাবতঃই সীমাবদ্ধতা বুঝতে অধিকার রক্ষা ও আদায়-এর প্রশ্নে শত্রু ও মিত্র চিনতে আন্দোলনের গুরুত্ব অপরিসীম। স্বার্থত্যাগ ও আন্দোলনের মানসিকতাকে বাদ নিয়ে এই সরকার টিকতে পারে না। তথ্যগত ভাবে বর্তমান অবস্থাকে সমাজ পরিবর্তনের একটা ধাপ হিসাবে ব্যবহার এবং বাস্তবে সেই রাজনৈতিক তথ্যকে প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে 'আসনমান জমিন ফারাক' দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে ছাত্র সংগ্রামের সপ্তদশবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে সমাপ্তি অধিবেশনে প্রমোদ দাশগুপ্তের বক্তব্য প্রনিধানযোগ্য "ছাত্রদের মধ্যে একটা প্রবণতা আছে Anti establishment প্রচারে ঝুঁকে পড়া এবং এ ব্যাপারে খুব সহজেই জনগণকে উত্তেজিত করা যায়। ছেলেবেলা থেকেই আমরা anti establishment এবং সেভাবেই লোককে আমরা শিখিয়ে এসেছি। আমরা জনগণকে কতটা শিখাতে পেরেছি establishment created by us অর্থাৎ আমরা যে সরকার তৈরী করলাম, আমার আন্দোলন কি তার বিরুদ্ধে যেতে পারে? আর সেই establishment মূলে যে establishment অর্থাৎ সমাজের যে রাষ্ট্র কাঠামো তার পরিবর্তনের জন্য কি ব্যবহার করতে পারব? এই শিক্ষা কি ছাত্রদের মধ্যে দিতে পেরেছি? কারণ আমরা যদি বলি বামফ্রন্ট সরকার আমাদের সরকার, এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করা যাবে না এই টুকু বললে বোধহয় ছাত্ররা খুশি হতে পারেনা। এই সরকার ছাত্রদের সরকার। এই সরকার গঠনের ব্যাপারে আনন্দ, নুরুলের মতো ১১০০ জন গণ-আন্দোলনের কর্মীর রক্তে গড়ে ওঠা establishment, আমি তাকে নিশ্চয়ই ভেঙে ফেলতে পারি না। আমি তাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করব। এটা ছাত্র সমাজকে বোঝাতে হবে নিজের ঘর নিজে কখনো ভাঙে না নিজের ঘর থেকেই বহিশক্রর আক্রমণের মোকাবিলা করতে হবে। নিজের ঘর থেকেই বৃহত্তর আন্দোলন সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে। এই ধারণা আজকে ছাত্র সমাজের মধ্যে গড়ে তুলতে হবে এবং তার উপর নির্ভর করছে 'ছাত্রসংগ্রামের' আদর্শগত সংগ্রামের ভূমিকা।"

আজকের দিনের ছাত্র আন্দোলনের প্রধান রাজনৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে আমরা BSF এর শেষ সভাপতি এবং পুনর্গঠিত BPSF-এর প্রথম সম্পাদক কমরেড দীনেশ মজুমদারের '৮০ সালে বহরমপুরে অনুষ্ঠিত SFI রাজ্য কমিটির বর্ধিত অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষনের কিছু নির্বাচিত অংশ তুলে ধরছি। কমরেড দীনেশ মজুমদার সেদিন ছাত্রসমাজের মধ্যে স্বৈরতন্ত্রের বিপদ সম্পর্কে প্রচার আন্দোলন গড়ে তোলা, মানুষকে সচেতন করা ছাত্র ফেডারেশনের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে বর্ণনা করেছিলেন। তাঁর বক্তব্য " স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই-এর কথা বলতে গিয়ে আমরা স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক অধিকারকে রক্ষা করার জন্য, গণতান্ত্রিক অধিকারকে সম্প্রসারিত করার জন্য যে সংগ্রাম -- সেই সংগ্রামের কথা বলছি। এস. এফ. আই. বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করে, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের আদর্শ প্রচার করে। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের অর্থই হচ্ছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ। মার্কসবাদ লেনিনবাদকে বাস্তবে প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি তার কর্মসূচী রচনা করেছে এবং আমি বিশ্বাস করি আপনারা তা পড়েছেন। কারণ ছাত্রসমাজ কোন সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে চলে না। সব কিছুই তাদের জানার আগ্রহের পরিধির মধ্যে থাকে।

...... মার্কসবাদ লেনিনবাদের শিক্ষা স্বৈরতন্ত্রের বিপদ সম্পর্কে আমাদের সম্যক ধারণা দেয়। এই বিপদ থেকে ভারতবর্ষেও আমরা মুক্ত নই। সুতরাং পার্লামেন্টারি পদ্ধতি, পার্লামেন্ট বহির্ভূত পদ্ধতি -- এই দুটোর সমন্বয় ঘটিয়ে গণআন্দোলন, গণসংগ্রামের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে অসম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সম্পূর্ণ করা এবং তার পরবর্তী স্তরে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্যে পৌঁছানোর দিকে আমাদের এগোতে হবে। সুতরাং এই সীমাবদ্ধ গণতান্ত্রিক অধিকার বুর্জোয়া সংসদীয় গণতন্ত্রের পতাকাকে রক্ষা করার প্রশ্নে আজকে জরুরী কর্তব্য হিসাবে আমাদের সামনে উপস্থিত হচ্ছে। আমরা অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি, জরুরী অবস্থার অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। '৭২-'৭৭ আধা ফ্যাসিস্ত সংগ্রামের অভিজ্ঞতা, আবার নতুন করে '৮০ সালের লোকসভা নির্বাচনের পর এই বিপদের সামনে আমরা এসে দাঁড়িয়েছি। সুতরাং এই বিপদ সম্পর্কে ব্যাপক মানুষ ও ছাত্র সমাজকে সচেতন করা -- এটা আজকে আমাদের অন্যতম দায়িত্ব ও কাজ।

.... গণতান্ত্রিক আন্দোলনের স্বার্থেই বামফ্রন্ট সরকারকে রক্ষা করা আমাদের রাজনৈতিক দায়িত্ব। বামফ্রন্ট সরকারে থেকে বর্তমান পরিস্থিতি মূল্যায়নের ভিত্তিতে আন্দোলন সংগ্রামের কর্ম কি হবে -- এই সম্পর্কে আমাদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মীদের মধ্যে স্বচ্ছ ধারণা সৃষ্টি করার দায়িত্ব আজকে আপনাদের সকলের রয়েছে -- সেই বিষয়টি উল্লেখ করছি। আমরা এই সরকারে আসার আগে আন্দোলন করেছি। শত্রুরা চিহ্নিত ছিল। সরকারের বিরোধী আন্দোলন। কাজেই সব শত্রুরা আইডেন্টিফায়েড্ ছিল তার সঙ্গে। কিন্তু মধ্যে ব্যতিক্রম ঘটে গেল। তাহলে আন্দোলনের বিভিন্ন ফর্ম -- বৈঠক করা, পোস্টার করা, গেট মিটিং করা, স্ট্রীট কর্ণার, বড় বড় সমাবেশ ঘটানো, ধর্মঘট করা, ঘেরাও করা, অবস্থান করা -- এই যে বিভিন্ন ফর্ম, যে অধিকার -- এ তো কেউ দেয় নি? আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়েই গণতান্ত্রিক শক্তি তা অর্জন করেছে। তাহলে আজকের সরকারে আছি। কোনটা করব, আগের মত সবটা করতে পারছি না। তাহলে কি অধিকার থাকল না? কোন ফর্মটা হলে আন্দোলনটা বিরাট হতে পারে? নানান সংশয়, নানান বিষয় উপস্থাপিত হয়। এই অবস্থাটাই আমাদের বুঝতে হবে। এটা বুঝতে হবে যে, এই ফর্মের অধিকার কেউ কেড়ে নিতে পারে না কারণ এই সরকার তাদের, আমাদের আন্দোলন সংগ্রামকে এগিয়ে

নিয়ে যাবার জন্যই তাকে প্রতিষ্ঠা করেছি। যদি আন্দোলন সংগ্রামের অগ্রগতির সামনে এই বামফ্রন্ট সরকার বাধা হয় তাহলে এই সরকার থাকবে কেন? কমরেড জ্যোতি বসু মন্ত্রীসভায় থাকবেন কেন? আমরা সেই সরকার পরিচালনায় সরকারের মধ্যে কেন থাকব? ধর্মঘট, মিছিল, মিটিং, ঘেরাও করার অধিকার আমাদের আছে, থাকবে। এ অর্জিত অধিকার। কিন্তু এই ফর্ম এবং অধিকার কোন ক্ষেত্রে কোনটা প্রয়োগ করব, কি কৌশল হবে, কোন পরিস্থিতিতে, সেটা নির্ধারিত করাই তো যারা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদে বিশ্বাস করে অর্থাৎ মার্কসবাদ লেনিনবাদকে বিশ্বাস করে তাদের দায়িত্ব। কোন ইস্যুতে লড়ছি? কোন পরিস্থিতিতে লড়ছি, কার বিরুদ্ধে লড়ছি তার উপর নির্ভর করে ফর্ম। যদি সরকারটা আমার হয় এমন কোন আন্দোলন করব না যাতে আমার সরকারটাই ভেঙ্গে যেতে পারে, আমার সরকারটা দুর্বল হয়। তাহলে ফর্ম সেভাবে নির্ধারিত হবে। কোন ফর্মই তো বাতিল হয় নি। কেন্দ্রের সরকারের বিরুদ্ধে ধর্মঘট হবে না? হবে, ধর্মঘট হবে। আমলাতন্ত্রের একটি অংশ প্রতিপদে বাধার সৃষ্টি করছে। যদি প্রয়োজন হয়, কোন বিশেষ ক্ষেত্রে — হ্যাঁ হবে। মন্ত্রিসভার সাথে আলোচনা করেই আমরা ঠিক করব। আমরা তো জানি, মন্ত্রি অর্ডার দিচ্ছেন, মন্ত্রি বলছেন — পারছেন না। তাহলে বাধা অপসারণ করার জন্য আপনি মন্ত্রিসভার ভেতর থেকে লড়াই করুন। তলা থেকে আমরাও করি। আলোচনা করে এটাই হবে। দৃষ্টিভঙ্গী এটাই হবে। কি ফর্ম ঠিক করব? স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সরকারের নীতি কার্যকর করছেন না, সরকারের কোন কথা শুনছেন না। প্রতিক্রিয়া শক্তির হাতের পুতুল হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে — গণআন্দোলনের বিরুদ্ধে — আমরা সরকারী যন্ত্র দিয়ে চাপা দেব। মন্ত্রীকে বলব — আপনিও চেষ্টা করছেন — হচ্ছে না। আমরা এই ফর্মে আন্দোলন শুরু করব। অর্থাৎ কোনটাই বাতিল হয়ে যায় নি। আবার কোন একটা ব্যবহার করা হল না বলেই আন্দোলন, সংগ্রাম হল না — এরকম ধারণা পরে ভুল হবে। পরিস্থিতি, ইস্যু, কার বিরুদ্ধে সংগ্রাম — এ সমস্ত কিছু মূল্যায়ন করেই আমাদের ফর্মটা ঠিক করতে হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গী যদি আমরা তলার স্তর পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারি, তাহলে কোন অসুবিধা হবে না — আন্দোলন সংগ্রামের প্রশ্নে। .... তাই আজকের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক টাস্ক ফুলফিল হবার পর আবার কি ফর্ম নেব তা আলোচনা করে ঠিক করতে হবে। সমাবেশ — আজকের এই পরিস্থিতিতে বিশাল, বিরাট সমাবেশ — আন্দোলনের একটা হাইয়েস্ট ফর্ম।

পরিশিষ্ট – ১

● বিগত ১৫টি সম্মেলন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত তথ্য :

সাল	সম্মেলন স্থল	সভাপতি	সম্পাদক
–	–	অশোক দাশগুপ্ত	শিবেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী
১৯৫২	কোচবিহার (জেলা ছাত্রসংঘ)	রাধিকা মোহন ভট্টাচার্য	সমরেন্দ্র নাথ সাহা
১৯৫৬	কোচবিহার (স্কাই প্লেয়ার্স)	চিত্ত বক্সী	প্রবোধ রায়
১৯৫৯	দিনহাটা (নিমনগর)	পবিত্র ভট্টাচার্য	আশু পণ্ডিত
১৯৬৪	কোচবিহার (নাট্যসংঘ)	মনোজ রায়	জ্যোতিষ ভৌমিক
১৯৬৮	কোচবিহার (গায়েত্রীদেবী মহাবিদ্যালয়)	শুভেন্দু ব্যানার্জী	তারিণী রায়
–	জেলা কমিটির সভা	কমল সেন (দেবুদা)	তারিণী রায়
১৯৭০	কোচবিহার (রামভোলা স্কুল)	কমল সেন	তারিণী রায়
১৯৭৩	কোচবিহার (সেবাভবন)	কমল সেন	রমাপতি গুপ্তচৌধুরী
১৯৭৫	কোচবিহার (নাট্যসংঘ – জেলা কনভেনশন)	নরেন দত্ত (আহ্বায়ক)	–
১৯৭৮	কোচবিহার (সান্ধ্য মহাবিদ্যালয়)	অজয় রায়	নরেন দত্ত
১৯৮১	কোচবিহার (সান্ধ্য মহাবিদ্যালয়)	অজয় রায়	নরেন দত্ত
১৯৮৩	তুফানগঞ্জ	নরেন দত্ত	রিয়াজুল হক
১৯৮৬	কোচবিহার (সুকান্ত মঞ্চ)	পার্থ সেনগুপ্ত	রিয়াজুল হক
১৯৮৮	মাথাভাঙ্গা (নজরুল সদন)	অরুণ করঞ্জয়ী	রিয়াজুল হক
১৯৯০	কোচবিহার (সুকান্ত মঞ্চ)	অভিজিৎ ভট্টাচার্য	অরুণ চক্রবর্তী
১৯৯৩	তুফানগঞ্জ (কমিউনিটি হল)	অজয় বাগচী	বিদ্যুৎ দে

পরিশিষ্ট – ২

- যাঁদের সাক্ষাৎকার আমরা গ্রহণ করেছি :

শিবেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী – '৪০-এর দশকের শেষার্ধে জেলার ছাত্র ফেডারেশনের অন্যতম সংগঠক। জেলা ছাত্র ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক।

অশোক দাশগুপ্ত – '৪০-এর দশকের প্রথমার্ধে প্রথম কোচবিহার, পরবর্তীতে রাজশাহী কলেজের ছাত্র ফেডাশেনের নেতা এবং জেলার ছাত্র ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি।

অনিল রায় – '৪০-এর দশকের ছাত্র ফেডারেশনের গোড়াপত্তনের সময়কার অন্যতম সদস্য, রাজতন্ত্র বিরোধী প্রজামণ্ডল সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক এবং '৪৬-এর ধুলিয়া উছলপুকুরীতে কৃষক বিদ্রোহের অন্যতম নেতা।

সমরেন্দ্র নাথ সাহা – '৫০-এর দশকের প্রথমার্ধে ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্র, '৫১ সালে খাদ্য আন্দোলনের সংগঠক ও কোচবিহার জেলা 'ছাত্রসংঘে'র সম্পাদক।

মনমোহন সেন – '৫০-এর দশকের প্রথমার্ধে ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্রনেতা, '৫১ সালে খাদ্য আন্দোলনের সংগঠক, কোচবিহার জেলা ছাত্রসংঘে'র সহঃ সভাপতি।

সরোজ বর্মা – '৫০-এর দশকের মধ্যবর্তী পর্যায়ের দিনহাটা মহকুমার ছাত্র ফেডারেশনের অন্যতম নেতা।

মনোজ রায় – '৬০-এর দশকের ছাত্রনেতা, ছাত্র ফেডারেশনের চতুর্থ জেলা সম্মেলন থেকে নির্বাচিত সভাপতি।

তারিণী রায় – '৬০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে '৭০-এর দশকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত জেলা ছাত্র ফেডারেশনের অন্যতম নেতা। '৬৮ সালে জেলা ছাত্র ফেডারেশনের সম্পাদক।

নরেন দত্ত – '৭০-এর দশকের জেলা ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক, '৭৫–'৮৬ সাল পর্যন্ত এস. এফ. আই.-এর জেলা কমিটির সম্পাদক ও সভাপতি ছিলেন।

অনুপম দত্ত – জেলা ছাত্র ফেডারেশনের '৬০-এর দশকের শেষার্ধের সময় থেকে '৭০-এর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত জেলা ছাত্র ফেডারেশনের অন্যতম সংগঠক। '৭১ সালে পসারিহাট মামলায় গ্রেফতার হন এবং দীর্ঘদিন বহরমপুর সেন্ট্রাল জেলে বন্দী ছিলেন।

বাসন্তী দে (দত্ত) – '৭০-এর দশকের ছাত্রী নেত্রী, '৭৫ সালে জরুরী অবস্থার সময় সংগঠনের অধিকাংশ নেতৃত্ব যখন আত্মগোপন করেছিলেন সে সময় নাট্যসংঘের জেলা কনভেনশনের মধ্য দিয়ে যে পাঁচ জনের কমিটি গঠিত হয় তার অন্যতম সদস্যা, '৭৪ সালে আইন অমান্য করে গ্রেফতার হয়ে জেলে যান।

দীপেন চৌধুরী – '৭০-এর দশকে জেলা ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম নেতা, '৭১-এর সাধারণ নির্বাচনের পর 'মারুগঞ্জ খুনের মামলা'র অন্যতম অভিযুক্ত আসামী, ছাত্র অবস্থাতেই ৪৫ বছর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত, জেলের ভেতর থেকে স্নাতক হন।

ললিত বর্মন – '৭০-এর দশকে মাথাভাঙ্গায় ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম নেতা ও জেলা কমিটির সদস্য, '৭১ সালে 'গোপাল সাহা খুনে'র মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত আসামী এবং পরবর্তীকালে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

শ্যামল ভট্টাচার্য – '৭০-এর দশকে মাথাভাঙ্গার ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম নেতা, 'গোপাল সাহা খুনে'র মামলায় অভিযুক্ত, '৭৫-এর জরুরী অবস্থায় জেলা প্রস্তুতি কমিটির অন্যতম সদস্য।

দীনেশ চন্দ্র ডাকুয়া – '৫০-এর দশকে ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্র নেতা, '৫৫ সালে ছাত্রসংসদের প্রথম সহ-সভাপতি।

সোহনলাল ভাদানী – '৪০-এর দশকের শেষার্ধে মাথাভাঙ্গার কম্যুনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম স্থপতি।

সুবল কুণ্ডু – '৭০-এর দশকে ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্রনেতা।

মোহনলাল মণ্ডল – '৭৪-এ কুচবিহারে শ্রী হিন্দি বিদ্যালয়ের ছাত্র এবং শঙ্কর প্রসাদ চক্রবর্তী গুলিবিদ্ধের ঘটনায় যে তীব্র ছাত্র আন্দোলন হয়েছিল তার অন্যতম সংগঠক এবং পরবর্তীতে গ্রেফতার হন।

অমিতেশ দত্তরায় – '৬০-এর দশকের দ্বিতীয়ার্ধে ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্র নেতা, প্রথম যুক্তফ্রন্ট ভাঙ্গার পর গ্রেফতার হন।

সৌমেন ঘোষ – '৫০-এর দশকে প্রেসিডেন্সি কলেজে ছাত্র ফেডারেশনের কর্মী, '৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলনের সময় ছাত্রফেডারেশনের অন্যতম কর্মী এবং '৭০-এর দশকে কংগ্রেসী সন্ত্রাসের শিকার।

পবিত্র ভট্টাচার্য – ৫০-এর দশকের শেষ ভাগ থেকে ৬০-এর দশকের ছাত্র ফেডারেশন-এর কর্মী ও নেতা, বি. পি. এস. এফ.-এর জেলা সভাপতি ও '৬০ সালে 'রবীন্দ্র জন্ম শতবর্ষ' উদযাপন কমিটির অন্যতম নেতা ও সংগঠক। ১৯৬০-'৬১ শিক্ষা বর্ষে ভিক্টোরিয়া কলেজের 'ছাত্র সংসদের' সহঃ সভাপতি।

জনযুদ্ধ
কমিউনিস্ট পার্টির বাংলা কমিটির মুখপত্র



গত ২৯শে আগস্ট বন্দী মুক্তি দিবস উপলক্ষে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে বিরাট ছাত্র সমাবেশ

পনর হাজার ছাত্রছাত্রীর ঐক্য অভিযান

রাজবন্দীদের মুক্তি চাই • কুচবিহার জুলুমের প্রতিকার চাই

ছাত্র ফেডারেশন থেকে ২৯শে আগস্ট বন্দীমুক্তি দিবস বলে ঘোষণা করা হয়। ১টার সময় ওয়েলিংটন স্কোয়ারে অগণিত ছাত্রছাত্রীর ভিড়। একটির পর একটি শোভাযাত্রা এসে যোগ দিচ্ছে। প্রায় পনর সহস্র ছাত্রছাত্রীর সমাবেশ। উদ্দীপ্ত কণ্ঠে গান হ'ল, "ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে মোদের বাঁধন টুটবে ততই টুটবে।" সহস্র কণ্ঠে গর্জন উঠল, "রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি চাই।" দারুণ উৎসাহের মধ্যে বন্দীমুক্তি ও কুচবিহারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। ছাত্র-ফেডারেশনের সম্পাদক অরুণ ভট্টাচার্য, গীতা মুখার্জী থেকে আরম্ভ করে প্রায় প্রত্যেক মতেরই ছাত্র প্রস্তাব সমর্থনে বক্তৃতা করলেন। চোদ্দ বছর পরে সদ্য-কারামুক্ত চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার মামলার বন্দী মণি দত্ত আকাশ-ফাটানো হর্ষধ্বনির মধ্যে উঠে দাঁড়িয়ে বল্লেন, "এই বিপুল ছাত্র সমাবেশকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমার কারারুদ্ধ বন্ধুরা জেনে আশ্বস্ত হবেন যে তাঁদের মুক্তির জন্য ছাত্রদের কী প্রচণ্ড সংগ্রাম!" "অনন্ত সিং গণেশ ঘোষের মুক্তি চাই" ধ্বনিতে মাঠ ভরে গেল। সভাপতি অধ্যাপক ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তাঁর বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বল্লেন, "আশা করি সকল রাজনৈতিক বন্দী মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত ছাত্রদের এই ঐক্যবদ্ধ অভিযানের অবসান হবে না।"

কলকাতায় কখনও এত ছাত্রী সমাবেশ দেখি নি। আশুতোষ কলেজের প্রায় শতাধিক মেয়ে (সকালে ক্লাশ হয়) শোভাযাত্রা করে সমস্ত পথটাই আসে। উইমেন্স কলেজের মেয়েদের উৎসাহে অধ্যক্ষ নিজেই একটার কলেজ ছুটী দিয়ে মেয়েদের শোভাযাত্রার অনুমতি দেন। ভিক্টোরিয়া কলেজ ও হস্টেল, যেখানে শুধু রাজনীতি নিষিদ্ধ নয়, কিছুদিন আগেও মেয়েদের সম্বন্ধে প্রায় মধ্যযুগীয় ব্যবহার চলত, সেখান থেকে একশতর উপর মেয়ে মিছিল করে আসে। সেখানকার উৎসাহী ছাত্রী কর্মী বল্লেন, "অনেক কষ্টে শোভাযাত্রা বের করা গেছে—তা রাজবন্দীদের জন্য না হয় একটু কষ্ট স্বীকার করলামই।" দক্ষিণ থেকে ৫ মাইল পথ হেঁটে আসে বেলতলা স্কুলের ছোট্ট ছোট্ট মেয়েরা। তাদের উৎসাহে দুজন শিক্ষয়িত্রী পর্যন্ত চলে আসেন। একটি ১০/১২ বছরের মেয়ের কিছুদিন আগে মা মারা গেছেন। সবাই তাকে বলে, 'তুই যাস্ নি।' মিনিট পাঁচেক পরে মেয়েটি "আমি থাকতে পারছি না" বলেই 'বন্দেমাতরম' চীৎকার দিয়ে দৌড়ে মিছিলকে ধরে ফেলে। আর একটি ১০ বছরের মেয়ে সারা পথ স্লোগান দিতে দিতে এসেছে। ছাত্রী-কর্মী গীতার কুচবিহারের উপর বক্তৃতা তাকে খুব নাড়া দিয়েছিল। সভার পরে গীতা যখন তাকে বাসে তুলে দিচ্ছেন, হঠাৎ এক লরি-বোঝাই সামরিক পুলিশ পাশ দিয়ে চলে যায়। মেয়েটি হাত মুঠো করে বলে ওঠে, "লক্ষীছাড়ারা"! গীতা প্রশ্ন করেন "কারা?" মেয়েটি বলে, "ঐ ওরা—ওদের মত লোকই তো এইসব অত্যাচার করেছে।" ছোট বড় ছাত্রছাত্রী সকলের মধ্যে এরকম উৎসাহ বহুদিন দেখা যায় নি। বন্দীমুক্তি কমিটির একজন সদস্য বল্লেন, "তোমাদের উৎসাহ দেখে মনে হচ্ছে বন্দীরা মুক্ত হ'ল বলে।"

ছাত্রদের দেশপ্রেমের কী পুনরভ্যুত্থান হয়েছে তা সবচেয়ে ভাল করে বোঝা যাবে, যদি মনে রাখি এরই মাত্র দুদিন আগে সোমবারে কী হয়েছিল। কুচবিহারের অত্যাচারের প্রতিবাদে কলেজে কলেজে স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মঘট হয়। প্রায় তিন হাজার ছাত্র শোভাযাত্রা করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে এসে জমায়েত হয়। সবারই মুখে এক কথা—"দমননীতির প্রতিবাদে ছাত্রসমাজ এক হও।" কিন্তু ছাত্র কংগ্রেস ও মীরজাপুর ষ্ট্রীটের ছাত্র ফেডারেশনের মধ্যে কী উপলক্ষে সভা হবে তাই নিয়ে তুমুল বচসা বাধে ও হাতাহাতি হবার উপক্রম হয়। ছাত্ররা উত্যক্ত হয়ে সভাস্থল ত্যাগ করে এবং আওয়াজ তোলে, "দলাদলি বন্ধ করো।" ঐ দিন ঝড়ের আবহাওয়ায় সভা শেষ হওয়া সত্ত্বেও মাত্র দু দিন পরে ২৯শে আগস্ট সমস্ত স্কুল-কলেজ থেকে ছাত্রছাত্রীদের বিরাট অভিযান

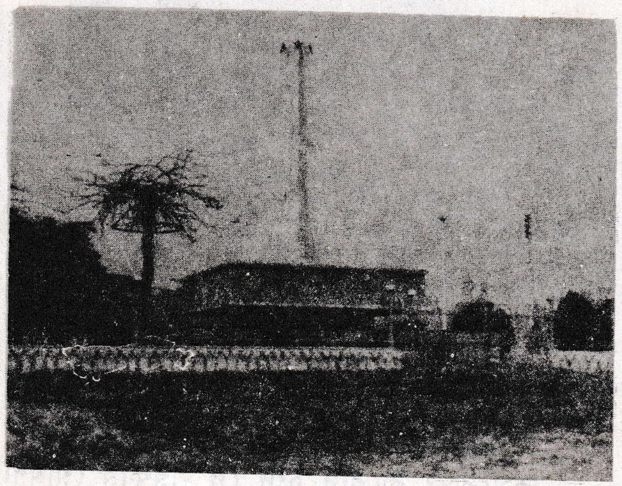
বিহারের লম্পট অফিসারদের প্রকাশ্য বিচার চাই



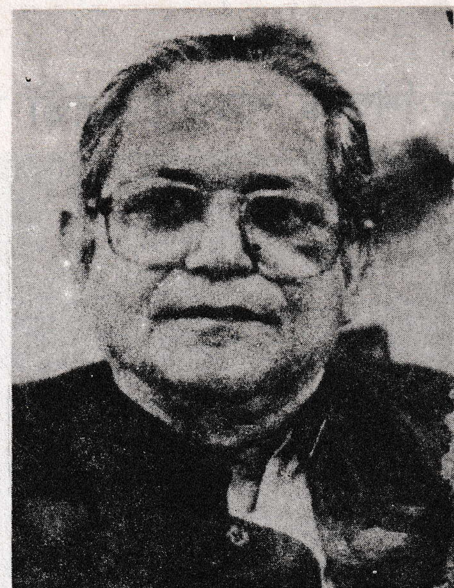


অতীতের আলেখ্য পট

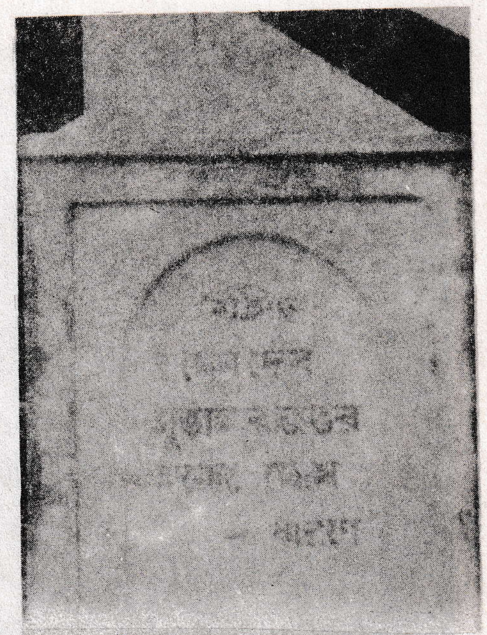
পঞ্চ শহীদ স্মরণে
ও
শহীদ শিক্ষক শঙ্কর চক্রবর্তী স্মরণে



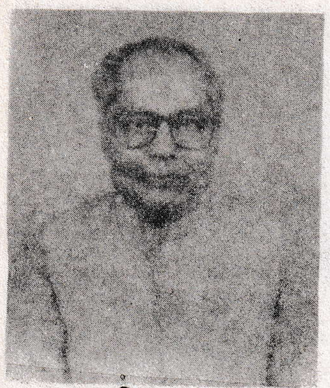




কমরেডঃ বীরেন্দ্র চন্দ্র দে সরকার (রবিদা)



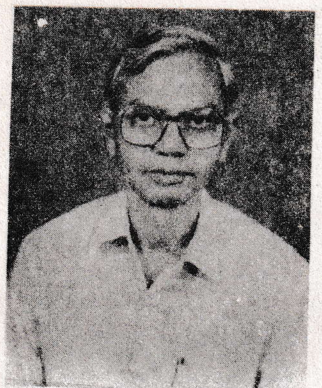
শহীদ মনোজ ঘোষ স্মরণে —



কমঃ শিবেন চৌধুরী



কমঃ অনিল রায়



কমঃ সমর সাহা



কমঃ রাধীকা মোহন ভট্টাচার্য্য



কমঃ কমল সেন



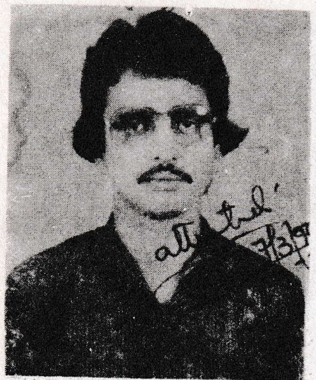
কমঃ পবিত্র কুমার ভট্টাচার্য্য



কমঃ তারিণী রায়



কমঃ মনোজ রায়



কমঃ রিয়াজুল হক্



কমঃ রমাপতি গুপ্ত চৌধুরী



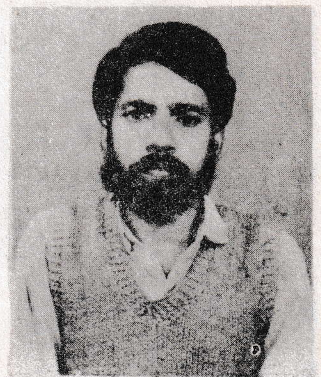
কমঃ অজয় রায়



কমঃ নরেন দত্ত



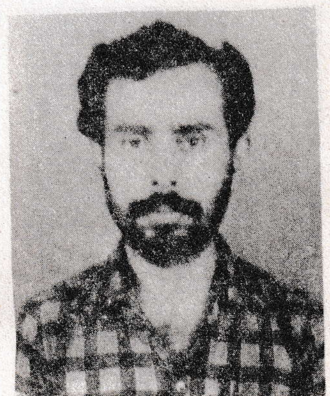
কমঃ অজয় বাগচী



কমঃ বিদ্যুৎ দে



কমঃ পার্থপ্রতিম সেনগুপ্ত



কমঃ অরুণ করঞ্জাই

আধা ফ্যাসীষ্ট সন্ত্রাসের দিনে আক্রান্ত ও যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত



কমঃ দীপেন চৌধুরী



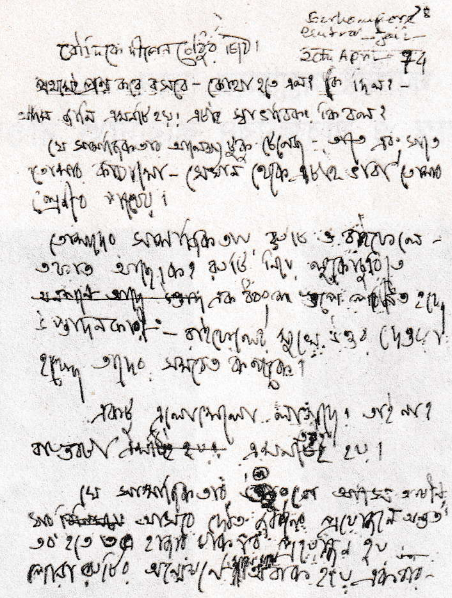
কমঃ দিলীপ বিশ্বাস



কমঃ সুদেব তন্ত্রী



কমঃ নরেন দাস



বহরমপুর
সেন্ট্রাল জেল
৩০শে এপ্রিল – '৭৪

প্রথমেই প্রশ্ন করে বসবে – কোথা হতে এল? কে দিল? আমি জানি এমনটি হয়। এটাই স্বাভাবিক। কি বল? যে সামাজিকতার আলেখ্যটুকু টেনেছ এবং যাতে তোমার কাঠামো – সেখান থেকে এটাই ভাবা তোমার শ্রেণীর পাথেয়।

তোমাদের সামাজিকতায় রুটি ও রাইফেলে তফাত আছে কি? রুটি নিয়ে লুকোচুরিতে এক ধ্বংসস্তূপে পরিণত হচ্ছে। উৎপাদনকারী – রাইফেলের মুখে উত্তর দেওয়া হচ্ছে তাদের সমবেত কণ্ঠকে।

একটু এলোমেলো লাগছে! তাই না? বাস্তবটা এমনইতর হয়।

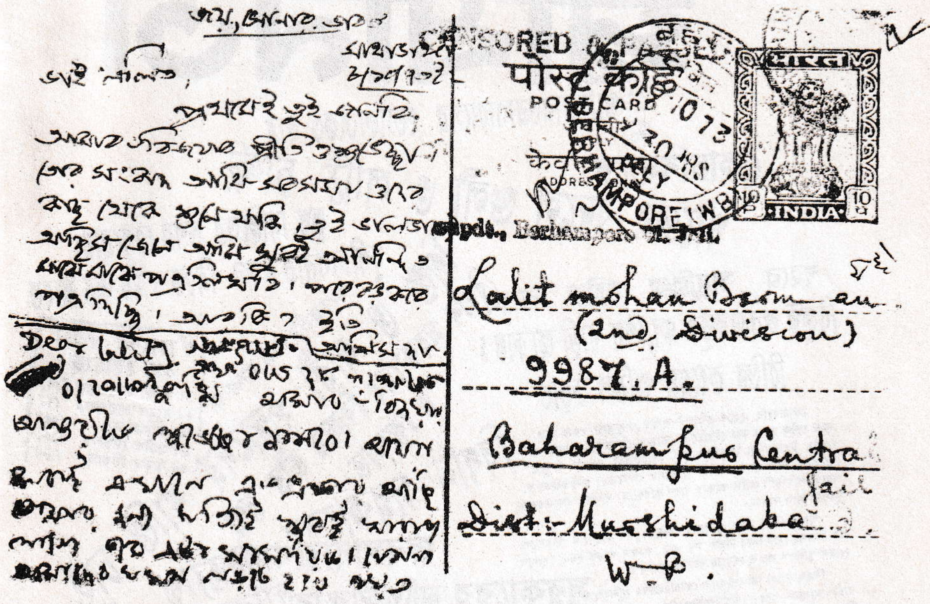
যে সামাজিকতার .... আসীন, যার আসরে দৌত জীবনের প্রয়োজনে অন্ততঃ ৩০–৩৫ হাজার টাকার প্রয়োজন হয় – পোড়া রুটির অন্বেষণে মাঝে মাঝে অবাক হয়ে একবার তাকাই কত মনোরম – মধুর সামাজিক সত্তা – তাই না?

জান বৌদি সত্যি বলতে গেলে বড় হওয়ার উপাদান প্রত্যেকের মধ্যেই আছে। এটা বাস্তব্ সত্য। কিন্তু কেন অধিকাংশই পায় না? খাবার ও বাঁচার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে। এটা জন্মের অধিকার। কিন্তু কেনই বা না খেয়ে মরতে হচ্ছে? উত্তর দিতে পারে তো আমাদের ঐ তথাকথিত সমাজ।

কি দেখছ এমন করে তাকিয়ে? গঙ্গার জলগুলো আজকে বর্শা ও বন্দুকের নলে রুপান্তরিত হচ্ছে। ওরা নতুন সৃষ্টির জন্য উসখুস করছে।

কাল বৈশাখীর বজ্র নিনাদে আঁৎকে উঠলে চলবে কেন? ও যে চরিত্রের ধ্বংসকারী – নববিশ্বের স্রষ্টা, মুক্তির দূত।

ইতি
দীপেন



মাথাভাঙ্গা
পশ্চিমপাড়া
তারিখ – ৮.১০.৭৩

প্রিয় ললিত,

প্রথমে তুমি আমার ঁরী বিজয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা এবং সেই সঙ্গে আমার সংগ্রামী অভিনন্দন জানবে। আশা করি মঙ্গল মতোই আছ। তোমাকে চিঠি দিতে দেরী হয়ে গেল সেইজন্য কিছু মনে কোরো না। এদিকে আমরা সবাই মোটামুটি ভাবে ভালই আছি। তবে তোর কথা চিন্তা করলে মনটা বড়ই খারাপ লাগে। যাক্ কোন চিন্তা নেই সাময়িক মাত্র পূজা হয়ে গেল কিন্তু পূজার কোন আনন্দ উৎসব সেইরকম হয়ে ওঠে নাই কেন না বর্তমান অবস্থা তো তুমি জান। পূর্বের তুলনায় অনেকটা অগ্রসর হচ্ছে, প্রগ্রাম মোটামুটিভাবে আমরা করছি। তুমি অনেকদিন আগে পত্রে জানিয়েছিলে যে, জেলের ভিতর পূজা হবে কিন্তু কি রকম হল – তা পত্র মারফৎ জানাবে আশা করি। আর কি লিখবো? তুমি এবং তোমার সহসাথীদেরকে আমার ঁরী বিজয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছি।

ইতি
শ্যামল

স্বাধীনতা

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডকেও হার

কোচবিহারে খাদ্যের বদলে গুলী ও লাঠি চার্জ্জ

ভুখ. মিছিলের উপর বেপরোয়া গুলীচালনায় ৬ জন নিহত ঃ ৪০ জন আহত

শহরে সামরিক ফৌজ তলব

বিক্ষুব্ধ জনতা কর্তৃক এস,পির বাড়ী আক্রান্ত ঃ

বিভিন্ন কংগ্রেস অফিস চড়াও

কোচবিহার, ২২শে এপ্রিল—আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য আজ ফৌজ তলব করা হইয়াছে। তাহারা কোচবিহার শহরের র রাস্তায় টহল দিয়া বেড়াইতেছে। সেক্রেটারী দপ্তরের সম্মুখে মিছিলের বিরাট জনতার উপর পুলিসের বেপরোয়া গুলীবর্ষণের ক শহরের পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করিয়াছে বলিয়া এক সরকার মুখপাত্র আজ জানান।

স্মরণ থাকিতে পারে, পুলিসের গুলীতে ২জন মহিলা ও ৭বৎসরের এক শিশুসহ মোট ৬জন নিহত হন এবং ৩২জন আহত হন। সংঘর্ষে ২৪জন পুলিসও আহত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

বিক্ষুব্ধ জনতা আজ সকালে কোচবিহারের পুলিসসু বাড়ী আক্রমণ করে। সুপারিন্টেণ্ডেন্টের বাড়ীর আসবাবপত্রেরও বিশেষ ক্ষতি হয়।

ক্ষুব্ধ জনতা ইহাতে ক্ষান্ত না হইয়া কোচবিহার মহকুমার মাথাভাঙা ও দিনহাটার কংগ্রেস অফিসেও হানা দেন এবং কংগ্রেস অফিসের নথিপত্র ও আসবাবপত্রগুলি বিনষ্ট করেন।

শহরের বিভিন্ন এলাকা হইতে খাদ্য-সংঘর্ষের সংবাদও পাওয়া গিয়াছে।

শিশু ও নারী হন্তাদের শাস্তি চাই

কংগ্রেসী রাম রাজত্ব

বিধান সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা ও বিক্ষোভ

যাঁহাদের হত্যা করা হইয়াছে

১। বজবা তালুকদার (১৬)
২। সুরেশ তালুকদার (৭)
৩। কবিতা বসু (২৫)
৪। সতীশ দেবনাথ (১৫)
৫। বাসন্ত বিশ্বাস (২০)

বিধান সরকারের পদত্যাগ চাই

জনসাধারণের দাবির

সরকারের নতিস্বীকার

১৪৪ ধারা প্রত্যাহার এবং জেলায় আংশিক রেশনিং চালু

হত্যাকারীদের প্রকাশ্য বিচারের জন্য সমস্ত দল ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দাবি

বিভিন্ন জনসভায় বে-সরকারী তদন্তের দাবি

কোচবিহারে জনতার শান্তিপূর্ণ ভুখ মিছিলের উপর পুলিসের গুলী-বর্ষণের ফলে যে হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইল তাহার বিরুদ্ধে বাংলার জেলায় জেলায় তীব্র প্রতিবাদ উঠিয়াছে। জনসাধারণ সভা করিয়া এই গুলী বর্ষণের ... এবং ... বে-সরকারী তদন্ত দাবি করিয়াছেন।

... ২৩শে এপ্রিল—গত শনিবার স্থানীয় সেক্রেটারিয়েট ... এলাকায় পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির সমাবেশ এবং ... ব্যবহারের উপর যে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হইয়াছিল তাহা প্রত্যাহার করা হইয়াছে এবং সারা জেলা ব্যাপী আংশিক রেশনিং ... হইয়াছে।

... থমথমে ভাব অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে। তবে ... ব্যবস্থা হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার মোড়গুলিতে সৈন্য ... এখনও টহল দিতেছে।

... স্বাধীনতা কমিটি, পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষক সভা এবং ছাত্র ফেডারেশন কোচবিহারে ভুখ মিছিলের উপর পুলিসের নৃশংস গুলী বর্ষণের নিন্দা করিয়াছেন।

প্রতিবাদে ঐক্য ফ্রন্ট গড়িয়া তুলুন

কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠনী কমিটির ডাক

কোচবিহারের ... ১০্ টাকা -দরে চাউল কিনিতে না পারিয়া ... খা পেটে মিছিল করিতে গিয়া পাইল ... গুলী। এই কি মার্কিন ধরনের ... তাজ? মার্কিন "দাক্ষিণ্যের ...

কোচবিহার ঘটনার প্রতিবাদে বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের কর্মীর কংগ্রেস ত্যাগ